স্বর্গের নীচে মানুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

স্বর্গের নীচে মানুষ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

হাসিখুশি প্রকাশন

সামনে একটি নদী, এই নদী পার হতে হবে।

পুরুষটির নাম রঞ্জন, তার বয়স ৩৪, স্বাস্থ্য সুঠাম, সে হালকা চকলেট রঙের প্যান্ট আর সাদা সার্ট পরে আছে। সাদা সার্ট তার প্রিয়। কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা।

মেয়েটির নাম ভাস্বতী, বয়েস ২৭, সে পরে আছে গাঢ় নীল রঙের শাড়ী ও ব্লাউজ -- ব্লাউজের তলায় ব্রা-র আউট লাইন চোখে পড়ে। তার ব্রা-র রং কালো, সায়ার রং কালো, পরে দেখা যাবে। তার ডাকনাম সতী, সবাই সেই নামেই নামেই ডাকে। তার নাম ঝর্ণা হলেও বেশ মানাতো। সে খুব সুন্দরী এবং অল্পবয়সী বালকের মতন দুরন্ত। রূপহীনা মেয়েদের গল্প আলাদা, রূপসী মেয়েদের গল্প আলাদা। এটা রূপের গল্প। এরা দু'জনে স্বামী স্ত্রী। এদের দুজনেরই আলাদাভাবে অনেক গোপন কথা আছে। যেমন অনেকেরই থাকে।

এক একদিন হয় না, দুপুরবেলাতেই আকাশটা সন্ধে বেলার মতন আঁধার হয়ে আসে। এই দিনটাও সেইরকম। নৈর্ঋত কোণ থেকে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে সারা আকাশ ছেয়ে আছে মেঘে। তবে সেই মেঘ যেন পাথরের মতন শক্ত, বর্ষণের কোনো চিহ্ন নেই। এই মেঘের পটভূমিকায় নদীর ওপারে পাহাড়টাকে গম্ভীর মনে হয়। এই সব দিনে কেউ নদী পেরিয়ে পাহাড়ে ওঠার সাধ করে না। কিন্তু ভাস্বতী বড় জেদী ।

পৌঁছোতে বেশ দেরি হয়ে গেল। সকাল থেকেই গাড়ি খারাপ। রঞ্জন বলেছিল, আজ আর বেরুবো না।

ভাস্বতী বলেছিল, সারাদিন ডাকবাংলোয় বসে থাকবো না।

রঞ্জন বলেছিল, কিন্তু গাড়ি যে খারাপ।

ভাস্বতী বলেছিল, মাত্র দু'বছর আগেও আমাদের গাড়ি ছিল না। তখনও আমরা বেড়াতে বেরুতাম। সুতরাং রঞ্জন গিয়েছিল দেড় মাইল দূর থেকে গাড়ির মিস্ত্রি ডেকে আনতে। মিস্ত্রি এসে ঠুকঠাক করে জানালো, গাড়ি গ্যারাজে নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে যাওয়া হলো ঠেলতে ঠেলতে। রঞ্জন চেয়েছিল, অনেক্ষকণ সময় লাগুক, মিস্ত্রি সম্প্রদায় জানালো, গাড়ির অনেক অসুখ, দুদিনের আগে সারবে না।

নিশ্চিন্ত ভাবে ডাকবাংলোয় ফিরে এসে রঞ্জন বললো, দু'দিনের আগে কোথাও যাওয়া হচ্ছে না। গাড়ির পাওয়া যাবে না।

ভাস্বতী বললো, বাস রয়েছে, মানুষ বাসেও বেড়াতে যায়। নইলে বাসগুলো চলে কেন?

রঞ্জন বললো, ভুল। বাসে চেপে মানুষ কাজকর্মে যায়। বেড়াতে যায় না। তা ছাড়া বাস নদীর ধার পর্যন্ত যাবে না। প্রায় এক মাইল হাঁটতে হবে।

-- হাঁটতে হবে বলে তুমি ভয় পাচ্ছো?

রঞ্জন ভীতু নয়। তার শরীরে শক্তি আছে, বুকে সাহস আছে। সে পৃথিবীর হেরে-যাওয়া মানুষের দলে নয়। বরং সে অতিরিক্ত পেয়ে থাকে। সে সাঁতারে মেডেল পেয়েছে, কলেজ টিমে, ক্রিকেট খেলেছে, ভূত বিশ্বাস করে না, শহরের রাস্তায় হঠাৎ হৈ চৈ শুরু হলেই সে দৌড়তে শুরু

না করে দাঁড়িয়ে দু'এক দন্ড দেখে, কিন্তু সে পাহাড়ে উঠতে ভালবাসে না। ভালবাসে না, ভালবাসে না–এর আর কোনো যুক্তি নেই। মোটর গাড়ি সুদ্ধু তাকে তুলে দাও পাহাড় চূড়ায় -- সে বিখ্যাত সৌন্দর্যগুলি উপভোগ করবে। কিন্তু ঐ সব সৌন্দর্যের লোভে সে হেঁটে পাহাড় চূড়ায় উঠবে না। অথচ সে পরিশ্রমবিমুখ নয়। সমুদ্রে সাঁতার কাটতে বলুক না কেউ, রঞ্জন এক কথায় রাজী ।অনেক মানুষেরই একরকম এক একটা অদ্ভুত দুর্বলতা থাকে।

বিশেষত, নদী পেরিয়ে এই পাহাড়টি দেখতে যাওয়া সম্পর্কে তার মনে মনে একটি অন্য আপত্তি ছিল। পাহাড়টি সম্পর্কে একটি কুসংস্কার জড়িত। সে কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে চায় না। ভাস্বতী যাবেই যাবে। এই ধরনের গল্প শুনলেই ভাস্বতী পরীক্ষা করে দেখতে চায়। হাতের কাছেই যখন রয়েছে। রঞ্জনের অভিমত হচ্ছে এই যে, এই সব কুসংস্কারের পরীক্ষার আগ্রহও এক হিসেবে একে স্বীকার করে নেওয়া।

-- তুমি কুঁড়েমি করে যেতে চাইছো না, তাই বলো! অত সব যুক্তি দেখাচ্ছো কেন?

রঞ্জন পাজামা ও গেঞ্জি পরে বসেছিল ডাকবাংলোর বারান্দায়। তার চওড়া কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির কাচে রোদ পড়ে ঝলসে উঠছে। তার সুঠাম স্বাস্থ্য, ইস্পাতের বর্মের মতন বুকের আকৃতি। এই মানুষকে দেখে কেউ অলস বলবে না।

তবু রঞ্জন হেসে বলেছিল, এক একদিন কুঁড়েমি করতেও মন্দ লাগে না! এসো না আজ সারাদিন শুয়ে থাকি।

ভাস্বতী তার হাত ধরে টেনে বলেছিল, না, ওঠো!

অতএব বেরিয়ে পড়তেই হয়। স্থানীয় লোকজন কেউ কেউ বলেছিল, পাহাড়টাতে উঠতে নামতে তিন ঘন্টা লাগে, আবার কেউ কেউ বলেছিল, ও পাহাড়ে ওঠাই যায় না -- দেখতে ছোট হলে কি হবে! আবার কেউ বলেছিল, সুন্দর রাস্তা তৈরি করা আছে, কোনো অসুবিধেই নেই। দু'একজন সরাসরি নিষেধ করেছিল ওদের যেতে। পাহাড় এবং পথ সম্পর্কে মানুষের নানারকম মত থাকে। যারা রাস্তা মাপে, তারা ছাড়া কেউ রাস্তার সঠিক দূরত্ব আন্দাজ করতে পারে না। পাহাড়ও কারুর কাছে সব সময়েই খুব দূরে, কেউ কেউ ভাবে, যত দূরেই হোক, যাওয়া যায়। তবে এই পাহাড়টির কথা একটু আলাদা। এরা পাহাড়টিকে ভক্তি করে, আবার ভয়ও করে।

রঞ্জন বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেছিল, এদের কথার ওপর নির্ভর করা যায় না। কারুর সঙ্গে কারুর কথা মেলে না।

ভাস্বতী বলেছিল, গিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে কোন্‌টা সত্যি।

রঞ্জন সাহসী, ভাস্বতী দুঃসাহসিকা। অথবা, গোঁয়ার শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। ঝরঝরে বাস, কিন্তু তার ফার্স্ট ক্লাস , সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস আছে।

ভাস্বতীর ইচ্ছে থার্ড ক্লাসে আর সব নারী–পুরুষের সঙ্গে মিলে মিশে যায়। রঞ্জন তাতে সম্মতি জানিয়েছিল, আপত্তি জানানো অর্থহীন বলে। কিন্তু বাসের কনডাকটার সে কথা কানেই তোলে না। কোন ভদ্রলোককে -- অর্থাৎ যাদের দেখলেই বোঝা যায় পকেটে পয়সা আছে, এবং ফর্সা চেহারার রমণীকে সে থার্ড ক্লাসে নিতেই পারে না -- সেরকম নিয়ম নেই। যুক্তিতর্ক বেশি দূর এগুতে পারে না -- কারণ কনডাকটারের সুবিধে এই যে, সে ভাস্বতী ও রঞ্জনের ভাষা কিছুই বোঝে না, নিজের ভাষায় জোরালো বক্তব্য রাখে, যা রঞ্জন ও ভাস্বতী বোঝে না। এ অঞ্চলে যে ভাষা চলে, তা ঠিক হিন্দীও নয়। মধ্য প্রদেশ।

ফলে, লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ফার্স্ট ক্লাসেই উঠতে হয়। ইঞ্জিনের গরম, পোড়া মোবিলের গন্ধে তবু যে অন্যান্য দরিদ্র মানুষের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে হয় না -- এইটুকুই এখানকার আরাম। দেড় ঘন্টায় পৌঁছোবার কথা, পৌঁনে তিন ঘন্টা লাগে। তবু ভাস্বতী বিরক্তি বোধ করেনি,

সে উচ্ছলতায় রঞ্জনকেও মাতিয়ে রেখেছিল। যেখানে ওদের নামতে হয়, সেখানে একটি খাবার দোকান। ভিজির ঘ্যাট ও রুটি । খাঁটি, অত্যন্ত বেশি গন্ধময় খাঁটি দুধে ভেজানো চা। কলকাতার মানুষের পরিচিত চায়ের কোনো স্বাদ তাতে নেই, বাড়িতে এ রকম চা দৈবাৎ তৈরি হলে কোলাহল শুরু হয়ে যেত। সেই চায়ের প্রধান গুণ, তা গরম। ওরা দু'গেলাস চা নেয়। শেষ করে আবার দু' গেলাস । এই এক ধরনের মজা।

এর পর এক মাইল হাঁটাপথ। স্বাভাবিক ভাবেই এক মাইলকে তিন মাইল মনে হয়। ইতিমধ্যে মেঘ ঘনিয়ে আসে। দ্বিপ্রহরকে মনে হয় সায়াহ্ন। ঝলমলে বহির্দৃশ্যকে অপ্রসন্ন মনে হয় এখন। আকাশে পাখি নেই। প্রচুর ফড়িংয়ের ওড়াউড়ি শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে মেঘ চিরে একটি বিমানের উড়ে যাওয়া -- খুবই অবাস্তব মনে হয়। যেন কখনো বিমান দেখে নি, এই চোখে ভাস্বতী আকাশের দিকে তাকায়।

রঞ্জন বললো, আজ আর না যাওয়াই উচিত। আকাশের অবস্থা একদম ভালো নয়।

ভাস্বতী বললো, আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

-- যদি অনেক রাত্তির হয়ে যায়?

-- যেখানেই থাকি, রাত্তির তো হবেই।

ভাস্বতীর এই উত্তরটিকে কোনো যুক্তি বলা যায় না। কিন্তু মেয়েরা এই রকম অযৌক্তিক কথা বলেই তো এত মোহময়ী। কেউ কেউ বলে রহস্যময়ী । রঞ্জনের মতন যুক্তিবাদী মানুষও ভাস্বতীর এই কথা শুনে হাসলো।

নদীটি ছোট। স্থানীয় সংবাদ, জল বেশি নয়, হেঁটে পার হওয়া যায়। প্রত্যক্ষ প্রমান হিসেবে একটি গরুর গাড়িকে পার হয়ে আসতে দেখা গেল। গরুর গাড়িটি পাহাড় থেকে আসে নি, ওপাশে নিশ্চিত অন্য লোকালয়ের রাস্তা আছে।

ভাস্বতীর কাঁধে ঝোলানো একটি বড় চামড়ার ব্যাগ। তাতে টুকিটাকি ব্যবহার্য জিনিসপত্র। বেশি ভারী। রঞ্জনের কাঁধে শুধু ক্যামেরা। এতে যেন কেউ মনে না করে যে রঞ্জন তার স্ত্রীকে দিয়ে ভারী ব্যাগ বইয়ে নিচ্ছে। ভাস্বতী সুন্দরী এবং আধুনিকা -- সে সাধ্য কি রঞ্জনের ? আসলে ব্যাগটা ওরা ভাগাভাগি ভাবে বইবে ঠিক করেছিল, ভাস্বতীরই অনুরোধে এবং মাত্র কিছুক্ষণ আগে ভাস্বতী সেটা নিয়েছে। এবার সেটা রঞ্জনের হাতে চলে এলো, নদী পার হবার জন্য শাড়ী উচু করলো ভাস্বতী। রঞ্জন রাজকাপুরের প্রসিদ্ধ ভঙ্গিতে গুটিয়ে নিল তার ট্রাউজার্স।

নদীর জলে পা দিয়েই বোঝা গেল, জল যেমন ঠান্ডা, তেমন তীব্র স্রোত। নদী ছোট হলে হবে কি, তেজ আছে। তার বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারো, কিন্তু তাকে সমীহ করতে হবে। কাঁচা লঙ্কার আকৃতি দেখে যেমন বোঝা যায় না কোন্‌টায় কতটা ঝাল হবে, নদীও সেইরকম। যদিও এই নদীতে সাঁতার কাটার সুযোগ নেই, তবু জলে পা দিয়ে মেজাজ ভালো হয়ে যায় রঞ্জনের।

-- সতী, আমার হাত ধরো।

ভাস্বতী সব কিছুতেই আনন্দ পায়। এই ঠান্ডা জল, স্রোতের টান -- তার স্পৃহাকে উত্তেজিত করে। এক হাতে চটি, অন্য হাত রঞ্জনের বাহুতে। বড় বড় পাথরের টুকরো পায়ের নীচে ধারালো খোঁচা দেয়। তবু সে হাসছে। হাসতে হাসতেই বললো, যদি কোনো জায়গায় জল বেশি থাকে?

ভাস্বতী সাঁতার জানে না। প্রখ্যাত সাঁতারুর সঙ্গে সাঁতার না-জানা মেয়ের বিবাহ হওয়া এমন কিছু অভাবনীয় ঘটনা নয়। বৈজ্ঞানিকের স্ত্রী কি পূজোআচ্চা করে না? অনেক মহাকবির স্ত্রীও কবিতাকে অপছন্দ করে গেছেন।

জল বেশি থাক বা না থাক, ভাস্বতীর প্রশ্নে ভয়ের চিহ্ন নেই। এ সবই কৌতুক । রঞ্জনের মুখ থেকে সে আশ্বাসবাণী শুনতে চায় -- যা শুনিয়ে রঞ্জন পরিতৃপ্ত হবে। পুরুষের দুর্বলতা চিনে

নিতে মেয়েদের তো একটু ও দেরি হয় না। মেয়েরা তো আর পুরুষদের রহস্যময় প্রাণী হিসেবে ভাবে না। নির্ভরযোগ্যতাই প্রধান যোগ্যতা। রঞ্জন নির্ভরযোগ্য, পাহাড়ে না হোক, জলে।

ভাস্বতীর শাড়ী উঠেছে হাঁটু পর্যন্ত। জল ক্রমশ বাড়ে তার চেয়েও বেশি। কেউ কোথাও নেই। এই নির্জনতা নারী-পুরুষকে বড় আনন্দ দেয়। এমনকি , স্বামী-স্ত্রীকেও । শয়নকক্ষে আর কেউ থাকে না -- তবু এই আকাশের নীচে পাহাড় ও নদীর পটভূমিকায় দু'জনে নিরালা হবার স্বাদ আলাদা। ভাস্বতী নিচু হয়ে নদী থেকে এক আঁজলা জল তুলে ছিটিয়ে দিল রঞ্জনের গায়ে।

রঞ্জন বিরক্ত হলো না। মধ্য নদীতে প্রবল স্রোতের মধ্যেও নিজেকে সুস্থির ভাবে স্থাপন করে সে ভাস্বতীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো। ভাস্বতীর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে হাসতে হাসতে বললো, ফেলে দিই, ফেলে দিই?

কেউ তো এখানে দেখবার নেই। কেউ তো জানে না যে সে কলকাতায় একটি বড় সংস্থার দায়িত্বপূর্ণ অফিসার! এখানে একটু ছেলেমানুষি করতে দোষ কি!

কেউ না দেখলেও কিছু কিছু ব্যাপার আসে যায়। ভাস্বতী তার শাড়ী উরুর অনেকখানি পর্যন্ত তুলে ফেলেছে, রঞ্জন সেদিকে একদৃষ্টে তাকালো। একটু লজ্জা পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকালো আবার । এবার তার দৃষ্টিতে ও মুখে অন্য ধরনের হাসি। ভাস্বতীর ফর্সা উরু, নীল শাড়ী যেন যবনিকা। যে-পুরুষ তার নিজের স্ত্রীকে শয়নকক্ষে বহুবার নিরাবরণ দেখেছে, ঘুমের ঘোরে ঐ উরুর ওপর রেখেছে অনুভূতিহীন হাত -- বহু দিনের বেলা তার স্ত্রী যখন পোশাক পাল্টেছে তার খুব কাছাকাছি, আর সে ভ্রুক্ষেপহীন ভাবে পড়েছে কোনো অকিঞ্চিৎকর বই -- আজ সে সেই শরীরেই কিছুটা গোপন আভাস পেয়ে রোমঞ্চিত । এরকম হয়।

জল আর একটু বাড়লো, ভাস্বতী শাড়ী আর তুললো না, সবটাই ফেলে দিল। ভিজে একাকার। সমসাময়িক আদিবাসী মেয়েরা এই নদী পারাপারের সময় শাড়ী ভেজায় না -- অনেক লোক থাকলেও, কারণ, তাদের দ্বিতীয় শাড়ী নেই । ভাস্বতীর কাছেও এখন আর দ্বিতীয় শাড়ী নেই, তবু সে পরনের পোশাক ভিজিয়ে ফেললো, শুধু নিজের স্বামীর কাছে লজ্জা পেয়ে। এরকম হয়। ক্রিস্তান ইসন্ট কাহিনীর রূপালি ইসল্টের মতন এখানে বলা যায়, সৌভাগ্যবান জল।

ভাস্বতী নিছক সাধারণ সুন্দরী নয়। তার চোখ, মুখ, নাক ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করলে নিশ্চয়ই কিছু কিছু খুঁত বেরুবে, কিন্তু তার আনন্দিত থাকার ক্ষমতাই তাকে অতিরিক্ত রূপসী করেছে। সে যেন এখন এই স্রোতস্বিনী নদীরই প্রতিরূপ।

ভিজে শাড়ী নিয়ে জল ঠেলে ঠেলে আসতে সময় বেশি লাগে। স্রোত বাধা পেয়ে প্রতিবাদের গুঞ্জন তোলে।

-- দ্যাখো , কি সুন্দর ছোট ছোট মাছ!

-- তাড়াতাড়ি এসো, সতী!

-- তুমি মাছগুলো দেখছো না কেন?

-- তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে না?

-- এখনো পৌঁছোলুমই না, এরই মধ্যে ফেরার কথা!

-- সাড়ে সাতটার পর আর বাস নেই। এখানেই তাহলে রাত কাটাতে হবে।

-- দারুণ হবে তাহলে। বেশ বনের মধ্যে --

সরু সরু ছাই রঙের মাছ সুরুৎ সারাৎ করে ঘুরছে জলের মধ্যে। এত স্রোত সত্ত্বেও তারা মাঝে মাঝে এক জায়গা নিশ্চল হয়ে থেমে থাকতেও পারে । এই জলে কোনো প্রকার শ্যাওলা জন্মায় না, ঝকঝকে বালি। অসংখ্য ফড়িং এখানে, ওদের মাথার ওপর ঘুরে ঘুরে উড়ছে কয়েকটা।

মাছ দেখার অতিরিক্ত উৎসাহে নিচু হতেই ভাস্বতী আর ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারে না -- হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় জলে। অবিলম্বে স্রোত তাকে কিছুটা দূরে টেনে নিয়ে যায়, ভয়মিশ্রিত কলহাস্যে চেঁচিয়ে ওঠে ভাস্বতী।

রঞ্জন তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে উদ্ধার করার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, তার কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা -- এবং ক্যামেরাকে জলে ডোবায় কোন গো-মূর্খ? রঞ্জন থেমেই থাকে -- কেননা এ কথাও তার মনে হয় যে, এখানে জল বেশি নেই, ভাস্বতী নাকানিচুবোনি খেলেও ডুবে যাবে না। ভাস্বতীকে বিয়ে করার আগে ভাস্বতীকে এরচেয়েও অগভীর জলে পড়ে যেতে দেখলে রঞ্জন ক্যামেরা নষ্ট করার ঝুঁকি নিয়েও জলে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

রঞ্জন সেখানে দাঁড়িয়ে হাসতে আরম্ভ করে। হাসতে হাসতেই বলে, বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে।

ভাস্বতী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভাস্বতী তখন হেমেন মজুমদারের ছবি। মুখে লজ্জার বদলে কৃত্রিম কোপ।

রঞ্জন কাঁধ থেকে ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়ায়। এত স্রোতে সে একটুও টলে না -- জলের মধ্যে সে এরকমই সাবলীল। প্রথম ছবিতে ভাস্বতী ভেংচি কাটলো। দ্বিতীয় ছবিতে ভাস্বতীর দু'হাত তার চুলে, মুখ ওপরের দিকে, মেঘের ছায়া পড়ে সেই মুখ পৌরাণিক নারীর মতন। ভাস্বতীর শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল। সেই মুহূর্তে, সেই বিশেষ মুহূর্তেই তার মনে হলো, কি সুন্দর এই বেঁচে থাকা!

দশদিকব্যাপী নির্জনতার মধ্যে এক নদী, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গ ভেজা নারী এবং সেই দৃশ্যকে চিরস্থায়ী করে রাখছে রঞ্জন।

।। ২ ।।

ওপারে পৌঁছে কব্জি থেকে রুমাল খুলে রঞ্জন ঘড়ি দেখলো। তিনটে দশ। গ্রীষ্মকালের দীর্ঘবেলা, রাত্রি নামার আগে অনেক সময় আছে। পাহাড়টি বিশেষ বড় নয়, এবং অধিকাংশ ভারতীয় ছোট পাহাড়ের মতনই, এর চূড়ায়ও একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি বেশ দূর থেকে দেখা যায়। এরকম অচেনা নির্জন পরিবেশে একটা মন্দির দেখলে খানিকটা স্বস্তি লাগে। মন্দির মানেই অন্তত জাতির আশ্রয়। শয়নং হট্টমন্দিরে।

চামড়ার ব্যাগে তোয়ালে ছিল, ভাস্বতী তা বার করে মাথা মুছলো, মুখ মুছলো। শাড়ী ব্লাউজ সম্পূর্ণ ভিজে গেছে, তার আর কিছু করার নেই। রঞ্জন চিন্তিত হলেও ভাস্বতী বলে, আমার কিচ্ছু হবে না। আমার অত সহজে ঠাণ্ডা লাগে না।

ওপারের রাস্তাটা নদীতে ডুব দিয়ে আবার এপারে উঠেছে, এবং ডানদিকে বেঁকে চলে গেছে সমতলভূমির দিকে। অপেক্ষাকৃত সরু একটা রাস্তা বাঁ দিকে, সেটিই পাহাড়ে ওঠার রাস্তা, বেশ বোঝা যায়। রাস্তাটি সরু হলেও দুর্গম নয় -- বহু ব্যবহারের চিহ্ন আছে, একটুখানি এগিয়েই ঢুকে গেছে বনের মধ্যে।

মাঝারি আকৃতি বৃক্ষের বন, তেমন গভীর নয়। ঝোপঝাড় খুব কম, প্রায় প্রতিটি গাছকেই আলাদা করে দেখা যায়। এই সব বনে বন্যপ্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বহু আগে। ভারতীয় বাঘ সিংহ নিয়ে অনেক উপকথা গল্প আছে, কিন্তু ঐ সব হিংস্র প্রাণী এখন সংরক্ষিত অরণ্যে ভ্রমণকারীদের কৌতূহলের বস্তু। অথচ অচেনা অরণ্য দেখলে এখনো গা ছমছম করে। বুনো শুয়োর বা ভাল্লুকেরও সচরাচর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেই রকম ছোটখাটো কিছু থাকলেও চিন্তার তেমন কারণ নেই, রঞ্জন সশস্ত্র।

সিগারেট ধরিয়ে রঞ্জন বললো, একটা গাইড-টাইড সঙ্গে নিয়ে এলে হতো।

ভাস্বতী রঞ্জনের হাত ধরে মোহমাখানো গলায় বললো, এখন আর কেউ এখানে থাকলে আমার একটুও ভালো লাগতো না।

-- যদি রাস্তা হারিয়ে যাই?

-একটাই তো রাস্তা দেখতে পাচ্ছি।

-- মন্থর পায়ে ওরা হাঁটতে শুরু করে। উপভোগ্য পদযাত্রা এরকম হয়। এসেই যখন পড়া গেছে, তখন আর মনের মধ্যে দ্বিধা রেখে লাভ কি, এই হিসেবে রঞ্জন নিজেকে তৈরি করে নেয়। খেলাচ্ছলে একটা পাথরের টুকরো পথ থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় অনেক দূরে, আর কোন পাথরে লেগে ঠক্ করে শব্দ হয়।

-- তুমি আসতে চাইছিলে না, কিন্তু জায়গাটা কি সুন্দর বলো তো!

-- হ্যাঁ, বেশ ভালোই জায়গাটা

-- কিরকম পরিষ্কার। আমাদের যদি কেউ এখানে নির্বাসনে দিত তো বেশ হতো! আমরা সারাজীবন এখানেই থাকতাম।

-- কতদিন?

-- আমি সারাজীবনই থাকতে পারি।

-- সত্যি পারবে? বাথরুম?

ভাস্বতী লজ্জা পেল। বিছানার বদলে তাকে মাটিতে শুতে দিলেও আপত্তি নেই। খাবার জুটুক বা না জুটুক, ভ্রুক্ষেপ করবে না সে। কিন্তু মনের মতন একটি ঝকঝকে বাথরুম না পেলেই তার মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে। যতবার তারা বেড়াতে গেছে, যে-কোন ডাকবাংলোয় পৌঁছে ভাস্বতী প্রথমেই শোয়ার ঘর দেখার বদলে বাথরুম পরীক্ষা করে দেখেছে। নোংরা বাথরুমের জন্য নির্দিষ্ট ডাকবাংলো ছেড়ে সাতাশ মাইল দূরের অন্য বাংলোতো এবারেই আসতে হয়েছে রঞ্জনকে।

ভাস্বতী এখন তবু তার সেই চরিত্র দুর্বলতা গোপন করে বললো, তাও থাকতে পারি। এখানে তো নোংরা কি নেই। বেশ একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে থাকতাম দু'জনে।

-- তারপর কুঁড়েঘরের সামনে একদিন একটা সোনার হরিণ আসতো -- আর তুমি সেটা ধরে আনবার জন্য আমার কাছে আবদার করতে।

ভাস্বতী শব্দ করে হেসে ওঠে। এমন একটা চতুর বাক্য বলে ফেলে রঞ্জন বেশ খুশি হয়। আর কেউ শ্রোতা নেই, তবু নিজের স্ত্রীর কাছেই একটা বেশ সাজানো সুন্দর কথা বলে ফেলারও আনন্দ আছে।

রাস্তার পাশে পড়ে আছে একটি সিগারেটের প্যাকেট ও ইংরেজি খবরের কাগজের একটি দোমড়ানো পৃষ্ঠা। দুটোই বেশ দূরের জিনিস। ওদের মতন দূরের মানুষ আরও এখানে আসে। রঞ্জন তিন চারদিন বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, খবরের কাগজ পড়েনি। মোটামুটি জাতে ওঠার মতন সিগারেট এখানে দুর্লভ। কৌতূহলবশে রঞ্জন কাছে গিয়ে খবরের কাগজের পৃষ্ঠাটির তারিখ লক্ষ করলো। দেড় মাসের পুরোনো।

রঞ্জন সিগারেট ধরিয়ে একটা গাছের গায়ে হাত দিয়ে বললো, এটা কি গাছ বলো তো? শাল না তমাল?

শহরের অধিকাংশ লোকই গাছ চেনে না। সাত আট রকমের বেশি ফুল চেনে না। তবু রঞ্জনের মুখে তমাল নামটা শুনে ভাস্বতী বেশ মজা পেল। সে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কখনো তমাল গাছ দেখেছো?

রঞ্জন বললো, না। তবে শাল গাছের সঙ্গে সঙ্গে তমাল গাছের নাম পড়িতো বইতে।

-- আমিও কখনো তমাল গাছ দেখিনি। আমার চেনাশুনো কেউ দেখে নি।

-- সেই রাধাকৃষ্ণের যুগও নেই, তমাল গাছও আর নেই বোধ হয়।

সিগারেট শেষ করে রঞ্জন আবার হাঁটতে শুরু করে। রাস্তা ক্রমশ চড়াই হয়। রঞ্জনের গতি কমে গেলেও বেশ তরতর করে এগিয়ে যায় ভাস্বতী।

-- তুমি একটু বিশ্রাম নেবে সতী!

-- আমি তো একটুও হাঁপিয়ে যাই নি।

-- পাহাড়ে উঠতে হয় আস্তে আস্তে। প্রথম দিকে তাড়াহুড়ো করলে, শেষের দিকে খুব কষ্ট হয়।

-- আমি পরেশনাথ পাহাড়ে উঠেছিলাম। আমার একটু কষ্ট হয় না। তোমার কষ্ট হচ্ছে?

মিনিট চল্লিশেক বাদেই মনে হলো, তারা পাহাড়টির প্রায় এক তৃতীয়াংশ উঠে এসেছে। রঞ্জন এতে বেশ সন্তুষ্ট বোধ করলো। এই গতিতে উঠলে সময় ঠিক আছে। নামবার সময় অনেক তাড়াতাড়ি নামা যায়।

রাস্তাটা এখান থেকে বাঁক নিয়েছে, বৃহৎ পাথরের আড়ালে অন্য দিকটা কিছুই দেখা যায় না। এখানে একটা বেশ চত্বরের মতন, বসে বিশ্রাম নেওয়া যায়, পাথরের গায়ে বহুকাল আগে কে যেন তার নাম খোদাই করে রেখেছে। এখন পড়া যায় না।

এখান থেকে নদীটা দেখা যায় গাছপালার আড়ালে। অনেকটা নিচে মনে হয়। নদীর জল এখান থেকে মনে হয় কালো কুচকুচে, অপবিত্র ধরনের। আসলে তো তা ছিল না। বেশ স্বাদু ও পরিষ্কার জল পার হয়ে এসেছে ওরা। এমন বদলে গেল কি করে?

আসলে আকাশটা বদলে গেছে আরও অনেকখানি। ঐ নদীর জল কালো নয়, সমুদ্রের জল যেমন নীল বর্ণ নয়। রঞ্জন আর একটা পাথর কুড়িয়ে নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করলো, নদী পর্যন্ত পৌঁছালো না।

এই সময় ঝড় উঠলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। শত শত ঘোড়সওয়ার ছুটে যাওয়ার মতন শব্দ। এমন প্রবল তেজী ঝড় ও বৃষ্টি পাহাড় অঞ্চলেই দেখা যায়। গাছগুলোর মাথা পাগলের মতন ঝটাপটি করছে। বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা তীরের মতন বিঁধছে পাথরে।

ওরা ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো একটা ঝাঁকড়া সেগুন গাছের নিচে। প্রথম প্রথম গায়ে জল লাগে না। একটু বাদে বৃষ্টির চেয়েও বড় বড় ফোঁটা ওদের ভিজিয়ে দেয়। আকাশ একেবারে ফেটে পড়ছে -- পাহাড়ী-রাস্তাটা এখন ঝরনার মতন -- কলকল করে তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে জল।

নিজেরা ভিজলেও ক্যামেরাটা বাঁচাতে হবে। রঞ্জন ক্যামেরাটা তাড়াতাড়ি ব্যাগের মধ্যে ভরে নেয়।

ওদের ভুরু একটু কুঁচকে আসে। অল্প অল্প শীতের মতন ভয়। এত অসম্ভব ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বিপদের গন্ধ আছে। নিজের বাড়িতে বসে জানলা দিয়ে এই রকম বৃষ্টির দৃশ্য দেখা প্রথাসিদ্ধ। কিন্তু অচেনা অরণ্যে এই দৃশ্য মনের মধ্যে একটা আস্তরণ ফেলে দেয়।

বিপদ এখনো আসেনি, সুতরাং ভয়কে আচ্ছন্ন করার সুযোগ দেয় না ওরা দু'জন। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে বিপন্ন হাসি বিনিময় করে। রঞ্জন একবারও বলে না, তোমার জন্যই তো এরকম হলো! সে পুরুষ, সে এখন বিপদ আড়াল করে দাঁড়াবে।

রঞ্জন ভাস্বতীর কাঁধে হাত দিয়ে তাকে কাছে টেনে নেয়। ভাস্বতী নিজের শরীর মিশিয়ে দেয় রঞ্জনের শরীরের সঙ্গে। আশ্বস্ত করার জন্য রঞ্জন ভাস্বতীকে চুম্বন করে। চুম্বনের কয়েকটি মুহূর্তে বৃষ্টিও ঝড়ের শব্দ মুছে যায়। চুম্বনটি দীর্ঘস্থায়ীই হয়।

তারপর ছাড়াছাড়ি হয়ে পরস্পর পরস্পরের চোখের দিকে তাকায় উজ্জ্বল দৃষ্টিতে। অঝোর বৃষ্টির ধারা ওদের মাথা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ভাস্বতীর লীঢ় ওষ্ঠ তৎক্ষনাৎ ধুয়ে যায় সেই জলে। সেই মুহূর্তে কড়কড়াৎ করে প্রচন্ড বজ্রপাতের শব্দ হয়।

রঞ্জন বললো, গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা বোধ হয় ঠিক নয়।

ঝড় ও বৃষ্টির চেয়েও বজ্রপাতের প্রবল শব্দ বুক কাঁপিয়ে দেয়। এই শব্দের মধ্যে একটা গম্ভীর হিংস্রতা আছে। তা ছাড়া রঞ্জন কার মুখে যেন গল্প শুনেছিল, একজন লোক বৃষ্টির সময় মাঠের মধ্যে একটা বড় গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল, সেই গাছের ওপরই বাজ পড়ে লোকটি মারা যায়।

রঞ্জন এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। গাছের তলা ছেড়ে কোথায়ই বা যাবে!

ঝড়ের প্রথম দিকে গাছগুলো থেকে ঝরে পড়েছিল প্রচুর শুকনো পাতা।

এখনো টুপটাপ করে কিছু পড়ছে, পাতা, ও শুকলো ডাল। কোথাও একটি গাছের বড় ডালে মড়মড় শব্দ হচ্ছে। যে-কোনো সময় গাছ ভেঙে পড়ার সম্ভবনা আছে, কিংবা বজ্রপাত।

ভাস্বতীর পায়ের প্রায় কাছেই একটা জীবন্ত কিছু পড়লো। একটা শালিকের বাচ্চা। ভাস্বতী দৌড়ে গিয়ে সেটা তুলে নিল। ভালো করে ডানা গজায় নি এখনো, রোয়া-ওঠা পাখিটি দু'চারবার ধুকপুক করেই মরে গেল। ভাস্বতী সেই মৃত্যু ঠিক বিশ্বাস করতে চায় না। এইমাত্র তার হাতের তালুতে একটা মৃত্যু ঘটে গেল? একটা প্রাণ তার হাত থেকেই চলে গেল কোথায়? এমন কি কোনো কথা ছিল যে, আজকে এই মুহূর্তে ভাস্বতী এই গাছের নিচে উপস্থিত থাকবে-- আর পাখিটা মরার জন্যই আসবে তার হাতের মুঠোয়? এর নামই নিয়তি।

রঞ্জন পাখিটা নিজের হাতে নিয়ে বললো, এঃ, মরে গেছে।

রঞ্জন সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, রাস্তার জলস্রোতে পড়ে ভাসতে ভাসতে চলে গেল মরা পাখি।

কিন্তু এই সামান্য ঘটনায় ভাস্বতী বেশ বিচলিত বোধ করে। এই প্রথম ঝড় ও বৃষ্টিকে তার অভিসম্পাত জানাতে ইচ্ছে হয়। নিজের হাতখানাকে তার মনে হয় কবরখানা। হাতখানা এগিয়ে দিল বৃষ্টির জলে।

রঞ্জন ভাস্বতীর সেই হাতটি ধরে বললো, চলো, এখানে আর দাঁড়ানো যাবে না।

ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো সেই বড় পাথরের চাঙড়টায় গা সাঁটিয়ে। এখানে আরও বেশি ভিজতে হবে, কিন্তু মাথার ওপর গাছ ভেঙে পড়ার সম্ভবনা নেই।

বৃষ্টি একটুও করেনি। এখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বৃষ্টির দাপাদাপি দেখা যায়।

ভাস্বতী ক্ষুন্ন গলায় বললো, আমরা যাতে পাহাড়টার ওপরে উঠতে না পারি, তাই একটার পর একটা বাধা আসছে। লোকেরা এই জন্যই আমাদের এখানে আসতে বারণ করছিল।

এইরকম বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যেও রঞ্জন তার বিশ্বাস হারায় না। সে বলে, ওসব বাজে কুসংস্কার। ঝড়-বৃষ্টি তো যে-কোন সময়েই আসতে পারে।

-- ঐ মরা পাখিটা!

রঞ্জন ফিরে ভাস্বতীর গালে একটা টোকা মেরে বললো, এসব কি বলছো কি?

-যাই হোক না কেন, আমরা ঐ পাহাড়ের ওপর উঠবোই।

রঞ্জন বললো, নিশ্চয়ই উঠবো। তবে আজ বোধ হয় ফিরেই যেতে হবে। সাড়ে চারটে বেজে গেল। আর বেশি দেরি করলে ফেরার উপায় থাকবে না। কাল আবার আসা যাবে না হয়!

ভাস্বতী তীক্ষ্ণভাবে জিজ্ঞেস করলো, কাল ঠিক আসবে?

-- কেন আসবো না! এবার ওয়াটারপ্রুফ আনা হয় নি, এই যা মুশকিল।

প্রথমে ঝকঝকে তকতকে অরণ্যে প্রবেশ করে, প্রয়োজন হলে এখানেই রাত্রিবাস করার একটা রোমান্টিক অভিলাষ ছিল ভাস্বতীর। কিন্তু এখন এই বৃষ্টি ও জল-কাদায় সেই ইচ্ছে উপে গেছে। তবে কাল আবার ফিরে আসতেই হবে। একবার যখন সে এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠবে ঠিক করেছে, উঠবেই। দরকার হলে বার বার ফিরে আসবে।

বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে কয়েকটা ব্যাঙ গলা মিলিয়েছে, তাদের দেখা যায় না। যে পাথরে ওরা ঠেস দিয়ে আছে, তারই এক কোণে একটা মাকড়সা এমন সুকৌশলে জাল বিস্তার করে আছে যে সেখানে একটু ও জল লাগে না। মাকড়সার রং কালো , তার পেটের আকার একটা আধুলির মতন। ভাস্বতীর মাকড়সা দেখলেই ঘেন্না হয়। অঞ্জলি করে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো সেই জালে। মাকড়সাটা একটুও নড়লো না, মুক্তো বিন্দুর মতন জলকণা ঝুলতে লাগলো।

রঞ্জন তক্ষুনি ফেরা পথ ধরতে চায়, কিন্তু একবার চেষ্টা করে দেখলো, বৃষ্টি না থামলে সে পাহাড়ী রাস্তায় নিচে নামার চেষ্টা করা বিপজ্জনক। পা পিছলে যাবার সম্ভবনা। তবু সে ভাস্বতীর হাত ধরে বললো, সাবধানে নামতে পারবে?

পাখিটার মৃত্যুর কথা ভাস্বতী ভুলতে পারছিল না বলে তখনও মন খারাপ। সে ম্লান গলায় বললো, পারবো। চলো। ফিরে যাই।

কয়েক পা গিয়েই রঞ্জন বুঝতে পারলো, এটা হঠকারিতা। এত ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ী ঢালু রাস্তায় কেউ পথ হাঁটে না। আবার পূর্ব আশ্রয়স্থলে ফিরে এলো।

-- এরকম বৃষ্টিতে আগে আর একবার ভিজেছিলাম। আসামে হাফলং-এ।

-- কবে?

-- বিয়ের আগে। সেই যে, বরুণের সঙ্গে গিয়েছিলাম।

-- সেটা তো চেনা জায়গা। অনেক মানুষজন থাকে।

-- শেষ পর্যন্ত ছুটতে ছুটতে আমি আর বরুণ একজন প্রোফেসারের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম।

ভাস্বতী একটু অন্যমনস্কভাবে বললো, আমার কোনদিন বৃষ্টিতে ভিজতে খারাপ লাগে না। আজ খারাপ লাগছে।

রঞ্জনও দু'এক মিনিটের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল। আগেকার সেই বৃষ্টিভেজার দিনের কথা ভাবছে।

জলের মধ্যে সরু সরু কি দু'একটা জিনিস নড়ানড়া করছে। সেদিকে নজর যাওয়ায় ভাস্বতী বললো, এগুলো কি?

-বোধ হয় কেঁচো।

-- পাহাড়েও কেঁচো থাকে?

ভালো করে লক্ষ করে রঞ্জন বললো, জোঁক মনে হচ্ছে?

তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে ভাস্বতী রঞ্জনের গা ঘেঁষে এলো। রঞ্জন বললো, এইখানে রাত কাটাতে হলেই হয়েছিল আর কি? আরও কত কি আছে কে জানে।

বৃষ্টি থামলো পাক্কা দেড় ঘন্টা বাদে। যেমন হঠাৎ নেমেছিল তেমন হঠাৎই থেমে গেল -- ঠিক যখন এই বৃষ্টিকে অন্তহীন মনে হচ্ছিল। বৃষ্টি থামার সঙ্গে সঙ্গে আবার উড়তে লাগলো অনেক ফড়িং। এত ঝড়জলের মধ্যে ফড়িংগুলো কোথায় ছিল কে জানে। জঙ্গলের চরিত্র বোঝা যায় না।

রঞ্জন ওর জুতোর ফিতে খুলে মোজা খুলে ফেলতে লাগলো পা থেকে। ভিজে মোজা নিয়ে হাঁটার মতন অস্বস্তি আর নেই, ভিজে কম্বলের চেয়েও খারাপ লাগে। ভাস্বতী তার শাড়ী ও সায়ার প্রান্ত একটু তুলে নিংড়ে নিল খানিকটা জল। ওরা এতই ভিজে জবজবে যে গা মাথা মোছার আর কোনো মানে হয় না।

।। ৩ ।।

ফেরার জন্য ওরা তৈরী হয়েছে, এমন সময় শোনা গেল মনুষ্যকণ্ঠ। একটা গানের মতন আওয়াজ, কথা বোঝা যায় না, শুধু সুর -- কণ্ঠস্বর খুব সুরেলা নয় -- অগায়করাও আপন মনে যে-ধরনের গান গায়।

ওরা দু'জন চোখাচোখি করলো, কোনো কথা বললো না। রঞ্জন একখানা হাত নিজের বুকের ওপর রেখে শান্ত হয়ে দাঁড়ালো।

সুরটা শোনা যাচ্ছে পাহাড়ের ওপর থেকে, তবে এগিয়ে আসছে কাছে। একটু বাদেই বড় পাথরটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো একটি মনুষ্য মূর্তি।

লোকটির গায়ে ভারী রেন কোট, পায়ে রবারের গাম বুট, মাথায় টুপি কপাল পর্যন্ত ঢাকা। তার হাতে একটা লম্বা লোহার জিনিস, দেখলে মনে হয় খুব বড় সাইজের চিমটে, সেটা দিয়ে সে ঝোপঝাড়ের ওপর আঘাত করতে করতে আসছে, আর গান গাইছে আপন মনে। কথা না বোঝা গেলেও গানের সুরটা এবার চিনতে পারলো ভাস্বতী। এই পরিবেশে এরকম গান শোনার কথা আশা করা যায় -- 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ/ সেদিন বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি , সে কি মা হর্ষ ..'। লোকটি বাংলা জানে।

লোকটি প্রথমে ওদের দেখতে পায় নি। অকস্মাৎ চোখ তুলে তাকালো। বিনা বাক্যব্যয়ে এগিয়ে এলো ওদের কাছে। আপাদমস্তক ভালো করে দেখলো গম্ভীর ভাবে। ভাস্বতীর দিকেই তার বেশিক্ষণ দৃষ্টি, বলাই বাহুল্য।

লোকটি যেন এই পর্বত ও অরণ্যের অধিপতি, তার ভাবভঙ্গি দেখলে এরকম মনে হয় । তার রাজ্যের এলাকায় আগন্তুক এসেছে বলে সে খুঁটিয়ে দেখছে।

গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো, বাঙালী?

রঞ্জন বললো, হ্যাঁ।

বৃষ্টিতে আটকে পড়েছেন?

হ্যাঁ।

-- ফিরে যাবেন?

-- তাই ভাবছি।

কথা বলার সময় লোকটি হাতের চিমটে দিয়ে মাটিতে ঠুকছিল। মাটি ভেদ করে পাথরে লেগে শব্দ হচ্ছিল ঠন্ ঠন্ ঠন্।

রঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো, বছরের এই সময়টা খুব খারাপ।

ভাস্বতীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললো, আপনি নিশ্চয়ই পাহাড়ের ওপরে মন্দিরটায় যেতে চেয়েছিলেন?

ভাস্বতীর বদলে রঞ্জনই উত্তর দিল, সে রকমই ইচ্ছে ছিল - আজ আর হবে না বুঝতে পারছি।

লোকটি হাসলো। যেন হঠাৎ সে একটা পুরনো মজার ঘটনা মনে করে ফেলেছে।

বৃষ্টি থেমে গেলেও আকাশের রং ময়লা। আবার যে-কোনো মুহূর্তেই বৃষ্টি নামতে পারে । আর যাই হোক, এটুকু অন্তত বোঝা যাচ্ছে যে আজ আর বিকেলের আলো ফুটবে না, এখন থেকেই সন্ধে শুরু হয়ে গেল।

মাথার টুপিটা খুলে ফেলতেই বোঝা গেল লোকটির বয়েস বেশি নয়। ছোকরাই বলা যায়, তিরিশের বেশি বয়েস হবে না, একমাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, অবিন্যস্ত। খাড়া নাক, রোদে পোড়া তামাটে রং। তীক্ষ্ণ চোখ। গলার আওয়াজটা ভরাট, কথা বলার ভঙ্গিও ভারিক্কী ধরনের।

-- আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

রঞ্জন বললো, কলকাতা থেকে।

লোকটা আবার হাসলো। যখন তখন হেসে ফেলা এর স্বভাব দেখা যাচ্ছে। কিংবা মুখে একটা কথা বলার সময় মনে মনে অন্য কথা ভাবে। বললো, কলকাতা অনেক দূর। এখন কোথা থেকে আসছেন?

রঞ্জন ডাকবাংলোটার নাম বললো। লোকটিকে এবার চিন্তিত দেখা গেল। টুপিটাকে পরিয়ে দিল মাটিতে গাঁথা চিমটের মাথায়।

ভাস্বতী এই প্রথম কথা বললো। লোকটিকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কোথায় থাকেন! কাছাকাছি?

লোকটি যেন চমকে উঠলো ভাস্বতীর গলার আওয়াজ শুনে। ভাস্বতীর মুখ ও ভিজে শরীরের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললো, এই পাহাড়েই আমার ঘর।

রঞ্জন আর ভাস্বতী দুজনেই অবাক হলো। এই পাহাড়ে ওর ঘর, তার মানে কি? ওপরের মন্দিটায় থাকে? পুরোহিত? হাতের চিমটেটা দেখে সন্ন্যাসী ভাবা যেতে পারতো। কিন্তু প্যান্ট, সার্ট, গাম বুট, রেন কোট, টুপী-পরা সন্ন্যাসী? পাহাড়ে অন্য যারা থাকে, তারা পাহাড়ী -- একে কি তা বলা যায়?

লোকটি পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরালো। কি মনে করে, নিজে ধরাবার পর, রঞ্জনের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, চলবে?

রঞ্জনের পকেটের সিগারেট জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে। সিগারেট পেয়ে সে কৃতজ্ঞ বোধ করলো। বললো, ধন্যবাদ! সাড়ে সাতটার মধ্যে আমাদের বাস ধরতে হবে।

-- তার আগে নদী পার হতে হবে।

-- হ্যাঁ। আচ্ছা চলি।

-- কোথায় যাবেন?

-- নদীর দিকে।

চামড়ার ব্যাগটা রঞ্জন তুলে নিয়ে ভাস্বতীকে বললো, চলো।

লোকটির সঙ্গে তাদের পরিচয় হয় নি, নাম জানাজানি হয় নি, সুতরাং আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেবার প্রশ্ন ওঠে না। অনেক দূরে বাঙালীর সঙ্গে আকস্মিকভাবে বাঙালীর দেখা হয়ে গেলে উচ্ছাস দেখাবার যে রীতি আছে, রঞ্জন বা ভাস্বতী তা মানে না। তবে লোকটির কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়েছে বলে রঞ্জন আবার ভদ্রতা করে বলে, আচ্ছা, চলি তা হলে।

ভাস্বতীও লোকটির দিকে তাকায়। সে ভাস্বতীর দিকেই একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এতে ভাস্বতী বিরক্ত হয় না -- এরকম তার অভ্যেস আছে।

লোকটি হাত তুলে বললো, আপনাদের আজ ফেরা হবে না।

ভাস্বতী রঞ্জনের দিকে তাকালো

রঞ্জন বললো, কেন?

-- ঐ নদী পেরুতে পারবেন না

-- আসবার সময় পেরিয়ে এসেছি।

লোকটি এবার শব্দ করে হাসলো। সেই নির্জন পাহাড়ী জঙ্গলে হাসিটার যেন প্রতিধ্বনিও শোনা যায়। লোকটির ভরাট গলার হাসি গমগম করে। নিজের হাসিটিকে বেশ উপভোগ করে লোকটি বললো, আসা আর যাওয়া কি এক কথা? এলেই কি যাওয়া যায় সব সময়?

রঞ্জন সোজা কথার মানুষ। এই ধরনের হেঁয়ালি করে কথা বলা সে ঘৃণা করে। অকারণ কথা বাড়িয়ে অনেকে আয়ুক্ষয় করতে ভালবাসে।

লোকটির কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সে ভাস্বতীকে বললো, চলো, এগিয়ে পড়া যাক।

ভাস্বতী লোকটির কাছ থেকে পুনশ্চ বিদায় নেবার জন্য ভদ্রতাসূচক ভাবে বললো, আমরা আবার কাল কিংবা পরশু আসবো।

রঞ্জন বললো, ঠিক নেই। যদি সুযোগ সুবিধে হয়-

লোকটি বললো, কালকের কথা কালকে। এখন আজকের কথা ভাবুন। আজ ফিরবেন কি করে? একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনুন।

একটু উৎকর্ণ হয়ে শুনলে সত্যিই একটা শব্দ শোনা যায়। জলের শব্দ। ভাস্বতী বললো, এদিকে কোথাও জল প্রপাত আছে?

-- নদীর শব্দ। আসবার সময় ঐরকম শব্দ শুনেছিলেন?

-- না, আসবার সময় এরকম কোন শব্দ শোনা যায় নি সত্যি। ছোট পাহাড়ী নদী। স্রোত আছে বটে, কিন্তু এরকম শব্দ তোলার প্রশ্নই ওঠে না।

-- এই সব পাহাড়ী নদী বৃষ্টির পর দারুণ বেড়ে যায়। কোনো নদীকে কখনো বিশ্বাস করা যায় না। এখন নদীটাকে দেখলে চিনতেই পারবেন না। এখন ঐ নদী পার হবার প্রশ্ন ও ওঠে না।

জলকে ভয় পায় না রঞ্জন। জল যতই বাড়ুক, তার কাছে কোনো বাধা নয়। ভাস্বতী সাঁতার জানে না -- সে কথা তখন তার মনেই পড়লো না, সে একটু অবজ্ঞার সুরে বললো, জল বাড়তে পারে, কিন্তু পার হওয়া যাবে না কেন? লোকে পার হয় কি করে?

-- লোকে পার হয় না।

-- তার মানে?

-- এখন দু'তিনদিন কেউ পার হতে পারবে না। এসব নদীতে নৌকোও চলে না।

রঞ্জন আর একটু কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে লোকটি বললো, সাঁতার জেনেও কোনো লাভ নেই - এত বেশি স্রোত যে এদিকে নামলে ওদিকে দু'তিন মাইল পরে গিয়ে উঠবেন -- তাও মাঝখানে পাথরে ঘা লেগে যদি মাথা না ফাটে।

-- গিয়েই দেখা যাক।

রঞ্জন যে লোকটির থেকে বয়েসে বড়, ওর ভাবভঙ্গিতে সেরকম কোনো চিহ্ন নেই। সব সময় কথা বলছে একটা উঁচু জায়গা থেকে। এবার কোনো বাচ্চা ছেলেকে বোঝাবার মতন নরম গলায় বললো, আমি এখানে অনেকদিন আছি তো। আমি জানি। তা ছাড়া, আপনি ঐ নদীটার নাম জানেন?

-- খাবারের দোকানাদার বলেছিল নামটা, ঠিক মনে নেই। বৈতার না কি যেন। নাম দিয়ে কি হবে?

-- নদীর নাম জেনে রাখা সব সময় জরুরি।

কেন-?

--স্থানীয় লোকেরা এই নদীকে বলে বৈতারা। তারা আসল নাম ভুলে গেছে। নদীটার আসল নাম বৈতরণী। বৈতরণী নদী একবার পেরিয়ে এলে আবার কি ফেরা যায়?

নিজের রসিকতায় লোকটি আবার হাসলো লঘুভাবে। ভাস্বতীর ঠোঁটেও একটা হাসির রেখা দেখা গেল। এই অদ্ভুদ ধরনের লোকটিকে তার খারাপ লাগছে না। সাধারণতঃ অচেনা লোকদের পছন্দ করে না সে। বেশির ভাগ লোকেরই কথাবার্তা এত বস্তাপচা সাধারণ হয়। বৈতরণী নদী সত্যিই এর নাম, না লোকটা নিজেই বানিয়েছে?

-- আপনি কে?

-- আমি বৈতরণীর এপারের লোক হলেও আমি একজন সাধারণ মানুষ।

এই কথাটা বলার সময় লোকটির মুখে এমন একটা সুক্ষ্ম হাসি ফুটে ওঠে, যার কোনো অর্থ বোঝা যায় না। যেন সে সাধারণ মানুষ -- এই কথা দুটির ওপর বেশি জোর দিচ্ছে -- এবং যেন সে দু'জন অসাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছে।

রঞ্জন ভ্রু কুঞ্চিত করলো। লোকটি বেশি বেশি হেঁয়ালি করছে। বৃষ্টির পরে এই পাহাড়ী জঙ্গলে কাজের কথা ছাড়া অন্য রকম হাস্য-পরিহাস মানায় না।

ভাস্বতী জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখানে থাকেন বললেন, আপনি এখানে কি করেন?

লোকটি সংক্ষিপ্ত ভাবে বললো, ব্যবসা করি।

তারপর ও বিষয়টি আর বিস্তারিত না করে আকস্মিক ভাবে বললো, গত সাড়ে চার মাসে এখানে আপনার মতন কোনো মহিলার গলার আওয়াজ শোনা যায় নি। দেখুন না, গাছপালাগুলো , পাথরগুলো পর্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে শুনছে আপনার কথা।

ভাস্বতী গাছপালা ও পাথরের দিকে তাকালো। যেন সে তার ভক্তদের দেখছে। তার ভালো লাগে।

রঞ্জন অসহিষ্ণু বোধ করলো। আজেবাজে কথা বলে সময় নষ্ট করা তার পছন্দ হয় না। লোকটির কাছে আরও কিছু খোঁজখবর নেবার জন্যে বললো, নদী যদি না পার হওয়াই যায় -- তাহলে এদিকে আর কোথাও থাকবার জায়গা নেই?

-- খোঁজখবর না করে আসা আপনাদের ভুল হয়েছে। বর্ষার সময় এদিকে কেউ সাধ করে আসে না।

-- কেউ কেউ আমাদের আসতে বারণ করেছিল।

-- আপনারা বিশ্বাস করেননি তো? অশিক্ষিত গেঁয়ো লোকের কথা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তারাই প্রকৃতির কথা সবচেয়ে ভালো জানে ।

রঞ্জন বললো, একটা ছোট নদী পার হওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার হতে পারে না।

লোকটি বললো, এই বিশেষ নদীটি পার হওয়া খুবই শক্ত।

ভাস্বতী একটু রেগে গিয়ে বললো, তা বলে বৃষ্টি পড়লে কি এদিকে আর লোক চলাচলা করে না? কোনো ব্যবস্থা নেই?

-- ভারতবর্ষের ক'টা নদীতে ব্রীজ আছে?

-- ব্রীজ না থাক, খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা থাকতে পারে না?

-- এ রকম অনেক জায়গাতেই কোনো ব্যবস্থা থাকে না। তাছাড়া, এই পাহাড়টার কথা আলাদা -- স্থানীয় লোকজনেরা এখানে ইচ্ছে করেই আসতে চায় না।

রঞ্জন বললো, নিচে অন্য একটা রাস্তা দেখলাম।

-- হ্যাঁ। মাইল ছয়েক দূরে একটা গ্রাম আছে। সেখানে যেতে পারেন। সেখানে কোনো পাকা বাড়ি নেই অবশ্য। তবে গ্রামের কোনো লোক থাকার জায়গা দিলেও দিতে পারে।

-- কি করে যেতে হবে?

-- হেঁটে। রাস্তা একটাই, রাস্তা হারাবার ভয় নেই।

-- রাত হয়ে যাবে পৌঁছোবার আগেই।

-- তা হবে। রাত হওয়া আটকাবেন কি করে?

-- আপনি কি মনে করেন, সেদিকেই আমাদের যাওয়া উচিত?

-- আমি ঐ গ্রামে কখনো রাত কাটাই নি। মাত্র দু'একবার গেছি। রাত্তির বেলা অজানা কোনো গ্রামে গিয়ে আশ্রয় চাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। সঙ্গে যুবতী নারী। তা ছাড়া, বলছে ছ' মাইল, আসলে ক' মাইল কে জানে! এরকম ভিজে পোশাকে ছ'মাইল পথ হাঁটাও কি মুখের কথা নাকি?

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, সতী, তুমি হাঁটতে পারবে ছ'মাইল?

ভাস্বতী ছেলেমানুষের মতন জিজ্ঞেস করলো, ছ'মাইল মানে কত দূর?

লোকটি বললো, -- ছ'মাইল মানে ঠিক ছ'মাইল। কিংবা বলতে পারেন তিন ক্রোশ - কিংবা প্রায় দশ কিলোমিটার।

রঞ্জন ওদিকে যাওয়ার ইচ্ছেটা একেবারেই পরিত্যাগ করলো।

ভাস্বতী জিজ্ঞেস করলো, পাহাড়ের ওপরের মন্দিরটায় লোকজন আছে?

-- কেউ নেই।

-- তা হলে মন্দিরটা আছে কেন?

-- এরকম থাকে।

-- আপনি কোথায় থাকেন তাহলে?

-- মন্দিরে থাকি না।

ভাস্বতী রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললো, মন্দিরটা যদি খালি থাকে, তা হলে আমরা রাত্তিরটা ওখানে কাটাতে পারি না?

ভাস্বতীর মনে অ্যাডভেঞ্চারের স্পৃহা জেগে উঠেছে। বাথরুমের প্রশ্ন মনে নেই কিন্তু জোঁক? এত উচুতেও কি তারা উঠবে?

রঞ্জন বললো, এখানে জোঁক কিলবিল করছে।

লোকটি বললো, এগুলো জোঁক নয়। কেঁচো। তবে এখানে অনেক সাপ আছে।

সাপের নাম শুনলে অন্য মেয়ে লাফিয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু ভাস্বতীর মনে হলো, পাহাড়ী জঙ্গলে সাপ থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! সে জোঁক কিংবা মাকড়াসা দেখলে শিউরে ওঠে, কিন্তু সাপ-বাঘ সম্পর্কে অহেতুক ভয় পুষে রাখেনি।

-- চলো, আমরা মন্দিরের দিকেই যাই।

লোকটি বললো, মন্দিরে এই সময়টা যাওয়া খুব কঠিন -- বৃষ্টির পর পাথর পিছল হয়ে আছে। শেষের দিকে রাস্তা খুব খারাপ -- ওপরে ওঠা খুব শক্ত।

ভাস্বতী বললো, ওপরে ওঠা যায় না তো মন্দির বানালো কি করে?

-- ওঠা যায় না তা তো বলিনি। ওঠা শক্ত। বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে। যদিও আপনি --

রঞ্জন মাঝপথে ওদের কথা থামিয়ে দিয়ে দৃঢ়ভাবে বললো, সতী, চলো তো। আমি ঠিক নদী পার হবার ব্যবস্থা করতে পারবো।

আর কিছু না বলে রঞ্জন হাঁটতে আরম্ভ করলো। ভাস্বতী চলে এলো তার পাশাপাশি। লোকটিকে কিছু বলা না হলেও সে আসতে লাগলো পেছনে পেছনে। টুপিটা মাথায় দিয়ে চিমটেটা তুলে নিয়ে সে আবার ঝোপঝাড় পেটাতে লাগলো। যেন সে তার নিজের কাজেই যাচ্ছে, ওদের সঙ্গে এই রাস্তায়।

রঞ্জন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটিকে দেখলো। লোকটির কোনো বদ মতলব নেই তো? এই পাহাড়ে একটি বাঙালীর ছেলে একা একা কেন থাকে? কিসের ব্যবসায়? অবশ্য ওর কথাবার্তায় একটা ভদ্রতার স্পর্শ আছে।

নদীটাকে দেখলে সত্যিই আর চেনা যায় না। বালিকা বয়েসের ছবি দেখে একজন যুবতীকে যেমন চেনা কঠিন। টগবগ ছলছল করছে জল, দুপারে অনেকখানি ডুবে গেছে। অন্ধকার নেমে এসেছে, সেখানে আর জনপ্রানীর চিহ্ন নেই। শুধু একটা ক্ষীণ যান্ত্রিক আওয়াজ পাওয়া যায়, ওপারে দূরের রাস্তায় কোনো গাড়ি চলছে। এই নদীটা পার হতে পারলেই পৌঁছানো যায় নিরাপদ আশ্রয়ে।

ভাস্বতী রঞ্জনের বাহু আঁকড়ে ধরে আছে -- নদীর বদলে একবার সে আকাশের দিকে তাকালো। সূর্য অস্ত যাবার আগে শেষবারের মতন একবার মেঘ ফাটিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে কয়েকটি রক্তিম রশ্মি। মনে হয় যেন এই পাহাড়ও নদী প্রকৃতিময় মঞ্চের ওপর আলোক-সম্পাত। এর পরেই রাত্রির দৃশ্য।

রঞ্জন বললো, তুমি যদি আমাকে শক্ত করে ধরে থাকতে পারো -- আমি ঠিক সাঁতরে ওপারে পৌঁছে যাবো! তুমি রিস্ক নিতে রাজী আছো?

ভাস্বতী চুপ করে রইলো। সে নিজেই ঝুঁকি স্বভাবের মেয়ে, কতবার রঞ্জনকে অনিশ্চত ঘটনাবলীতে জড়িয়ে পড়ার জন্য প্ররোচনা দিয়েছে, ভয় পাওয়া তার চরিত্রে মানায় না। কিন্তু সাঁতার জানে না, জলের প্রতি তার ভয় কিছুতেই যাবার নয়। তার রক্ত মাংস চামড়ার মতনই এই ভয় বাস্তব। এই ভয়ের কাছে সবাই একা। অত্যন্ত প্রিয়জনের সান্ত্বনাও মনকে শান্ত করে না।

লোকটি খানিকটা দূরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠোঁটে অল্প অল্প হাসি। সম্প্রতি সে একটা গাছের ডাল ভেঙে নিল। নদীর কাছে এগিয়ে দিয়ে সেই পাতাশুদ্ধ ডালটা বেশ জোরে ছুঁড়ে দিল জলে।

মুহূর্তে নদীটা কোনো জীবন্ত প্রাণীর মতন গ্রাস করে নিল ডালটাকে। পরক্ষণেই সেটা আবার ভেসে উঠলো খানিকটা দূরে -- ঝটাপাট করে লড়াই করে যেন বাঁচতে চাইছে। তারপর আর সেটাকে দেখা গেল না। ভাস্বতী এবার সত্যিই শিউরে উঠলো।

লোকটি গাছের ডালটা জলে ছুঁড়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই ওদের দেখাবার জন্য। কিন্তু কোনো কথা বললো না। রঞ্জন ও গাছের ডালটার পরিণতি দেখলে, কিন্তু এর মধ্যে একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার আছে বলে শক্ত হয়ে এলো তার চোয়াল।

রঞ্জন হাতের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে জামা খুলে ফেললো। কোমর থেকে রিভলবার সমেত বেল্টটা খুলে দিল ভাস্বতীর হাতে। প্যান্ট খুলে ফেলতেও দ্বিধা করলো না - নীচে জাঙ্গিয়া। রঞ্জনের সুগঠিত স্বাস্থ্যের মধ্যে একটা দুঃসাহস আছে। সেই জীবন্ত নদীর পাশে এমন মানুষ মানায়।

-- দাঁড়াও আমি দেখছি।

রঞ্জন নদীতে নামলো এক পা এক পা করে। স্রোত আগের চেয়ে বেশি, আগে যেখানে গোড়ালি ডোবা জল ছিল, এখন সেখানেই হাঁটু ডুবে যায় - তবু এমন কিছু ভয়ংকর মনে হলো না তার। কিন্তু রঞ্জন যেই কোমর জল পর্যন্ত নেমেছে -- অমনি প্রবল স্রোতের ঝটকা টানে সে পড়ে গেল আছড়ে। তারপর সেই ডালটার মতন অবস্থা। রঞ্জন সাঁতার কাটারও সুযোগ পাচ্ছে না।

ভাস্বতী চেঁচিয়ে উঠলো, এই --।

আর কোন শব্দ বেরুলো না তার মুখ থেকে। তার মনে হলো, রঞ্জনের সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়ে গেছে। রঞ্জন আর ফিরবে না। এই মুহূর্ত থেকে সে বিধবা। এখন সে কি করবে?

লোকটি ক্ষিপ্র পায়ে দৌড়ে গেল নদীর পার ধরে সামনের দিকে। একটু জায়গায় একটা বড় পাথর জেগে আছে জলের মধ্যে। লোকটি তার ওপর লাফিয়ে গিয়ে হাতের চিমটেটা বাড়িয়ে দিল। ধমক দিয়ে বললো, কি করছেন কি, পাগলের মতন --

রঞ্জন চেষ্টা করেও আসতে পারছে না কাছে। ঢেউ তাকে উল্টে-পাল্টে ফেলছে, জলের ওপর মাথা তোলারও শক্তি নেই। লোকটি নিজে বিপজ্জনক ভাবে ঝুঁকে লম্বা চিমটেটা ধরে রাখলো রঞ্জনের মাথার সামনে, চিৎকার করতে লাগলো, হাত তুলুন, সামনে পাথর আছে, সাবধান!

চিমটেটা ধরে ফেলে রঞ্জন উঠে এলো আস্তে আস্তে। কোনো কথা না বলে জামা প্যান্ট পরতে লাগলো। বিপদে পড়লেও রঞ্জন মৃত্যুভয় পায়নি। কিছু দূর গিয়ে সে ভেসে উঠতোই। আস্তে আস্তে বললো, স্রোতের টানটা বড্ড বেশি।

ভাস্বতীর মুখখানা রক্তিম। মনে মনে সে রঞ্জনকে মেরে ফেলেছিল। রঞ্জন ফিরে আসায় সে যেন নিজের কাছে অপরাধী হয়ে গেছে।

যুবকটি ওদের কাছে এগিয়ে এসে বিনম্র ভাবে বললো, আজ রাত্তিরে আপনারা আমার অতিথি। আমার নাম প্রসেনজিৎ বর্মণ।

-- আমার নাম রঞ্জন সরকার। আমার স্ত্রী ভাস্বতী।

তিনজনে হাত জোড় করে নমস্কার করলো। তারপর তিনজনেই আর একবার তাকালো নদীটির দিকে। নদীর চরিত্র চিরকালেই দুর্বোধ্য।

।। ৪ ।।

যেখানে ওরা বৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়েছিল, তার খুব কাছেই লোকটির ঘর। বড় পাথরটার আড়ালের জন্য ওরা দেখতে পায়নি আগে।

ফেরা পথটুকু দীর্ঘ মনে হয়। রঞ্জন লোকটির সঙ্গে কথা বলছে। ভাস্বতী একা একা হাঁটছে আগে আগে। বৃষ্টি থেমে গেলেও এদিকে ওদিকে জল ঝরার শব্দ। শোনা যাচ্ছে কতকগুলো শালিক পাখির কিচিরমিচর। এ পাহাড়ে পাখির বিশেষ সমারোহ নেই। ফুলও তেমন চোখে পড়ে না --

তবে এক ধরনের পরগাছার সাদা ফুল মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। রাত্রে যখন এখানে থাকতেই হবে -- এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় ভাস্বতীর মনে আর কোনা জড়তা নেই - তার পায়ের গতি এখন চপলা।

-- আপনি এখানে কতদিন আছেন?

-- এই পাহাড়ে সাড়ে চার মাস হবে। কাজ ফুরিয়ে গেলে আবার অন্য পাহাড়ে যাই।

আপনার বাড়ী কলকাতায়

-- না। আমরা ত্রিপুরার লোক, তবে আমি অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই আছি ভূপালে।

পাহাড়ে এমনভাবে বাড়ি বানিয়ে থাকা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয় - বিদেশের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই থাকে , রঞ্জন দেখেছে। হয়তো এদেশেও অনেকে রয়েছে, এরকম ভাবে, সে খবর রাখে নি। কিন্তু সম্পূর্ণ একা থাকা?

-- আপনার ঠিক কি ধররের কাজ?

-- আমি সাপ ধরার ব্যবসা করি।

বাড়িটা তাঁবু ও কুঁড়েঘরের মাঝামাঝি। কাঠের ফ্রেমে তিন পাশে ত্রিপল লাগানো, পাহাড়ই একদিকের দেওয়াল। ওপরে টিন। খুব সহজেই এই বাড়িখানা সবসুদ্ধু খুলে নিয়ে অন্য জায়গায় আবার বসানো যায়। ভাস্বতী এই রকম পাহাড়ী জায়গায় ঘর বানিয়ে থেকে যাওয়ার যে কল্পনা করেছিল, সেই কল্পনার ঘরের সঙ্গে এইরকম বাড়ি মেলে না। এটা বেশ কেজো ধরনের এবং আধুনিক।

ভিতরে দুটি কামরা। একটিতে দুটি ক্যাম্প খাট পাতা, কিছু টুকিটাকি জিনিসপত্র, একটি রাইফেল। পাশের ঘরে শুধু অনেকগুলো খাঁচা।

ঘরে ঢুকে প্রসেনজিৎ রেন কোটটা খুলে ফেলার পর দেখা গেল, তার লম্বা ছিপছিপে চেহারা -- এতক্ষণ বেশ ভারী দেখাচ্ছিল। রেন কোটের তলায় সে শুধু পরেছিল ফুলপ্যান্ট ও গেঞ্জি। জামা-টামার বালাই নেই।

-- আপনাদের জামা কাপড় সব তো ভিজে গেছে। সঙ্গে আর কিছু আছে?

রাত কাটাবার তো কোনো পরিকল্পনা ছিল না, তাই সঙ্গে আর কিছু আনা হয়নি। তাছাড়া ভাস্বতীর স্বভাবটা অগোছালো, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাবধানী চিন্তা তার ধাতে নেই।

-- ভিজে পোশাক পরে তো থাকতে পারবেন না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমার কাছে ধুতিটুতিও নেই। কয়েকটা পাজামা আছে অবশ্য -- তার দুটো পরে নিয়ে জামাকাপড়গুলো মেলে দিন - কাল শুকিয়ে যাবে।

-থাক না, তার কিছু দরকার নেই।

প্রসেনজিৎ একটা বিছানার তলা থেকে দুটো পাজামা ও দুটি গেঞ্জি বার করে রঞ্জনের হাতে দিয়ে বললো, ইস্ত্রি করা না থাকলেও কাচা আছে, ব্যবহার করার অসুবিধে কিছু নেই।

-আপনাকেই খুব অসুবিধেয় ফেললাম।

প্রসেনজিৎ পর্যাক্রমে দু'জনের দিকে তাকিয়ে হাসলো। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

প্রসেনজিৎ ঘর থেকে চলে যাবার পর একটুক্ষণ ওরা দু'জনে চুপচাপ। ভিজে শরীরে একটু একটু কাঁপুনি। দু'জন পরস্পরের অতি চেনা মানুষ, দু'এক মুহূর্ত কোনো কথা খুঁজে পায় না। চোখ সরিয়ে নেয়।

রঞ্জন আফসোসের সুরে বললো, কিছু জামা-কাপড় সঙ্গে না নিয়ে আসা খুবই ভুল হয়েছে।

ভাস্বতী জানে, রঞ্জন অন্য কারুর পোশাক পরা একেবারেই পছন্দ করে না। দিল্লীর একটা ডাইং ক্লিনিং থেকে একবার তার একটা শার্ট বদলে দিয়েছিল। সার্টটা তার নিজেরটার চেয়ে ভালো --সাইজও এক। তাড়াতাড়ি দিল্লী থেকে চলে আসবার জন্য সার্টটা পাল্টানো যায় নি -- কিন্তু রঞ্জন সেটা কোনোদিন পরে নি। চাকরকে দিয়ে দিয়েছিল। রঞ্জনকে যদি বাধ্য হয়ে এই পোশাক পরতে হয় - তা হলে এখন থেকে তার মেজাজ খারাপ হতে শুরু হবে। অথচ উপায় তো নেই।

ভাস্বতী একটু হালকা করার জন্য হেসে ফেলে বললো, আমি কি এই পাজামা পরে থাকবো নাকি?

-- ভিজে শাড়ী পরে তো সারারাত থাকতে পারবে না।

-- তুমি ভিজে পোকাশ না ছাড়লে আমিও ছাড়বো না।

ঘরের একটা দরজা আছে। দরজাটা আলগা, পাশে সরানো। রঞ্জন সেটা লাগিয়ে দিল -- প্যান্ট, সার্ট, জাঙ্গিয়া, গেঞ্জি খুলে সেই পাজামা ও গেঞ্জি পরলো বিনা বাক্যব্যয়ে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখার পর ভাস্বতী শাড়ীটা ছেড়ে ফেললো। সিল্কের শাড়ী জলে ভিজে বেজায় ভারী। মেলে দিলে শুকোতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না। ব্লাউজটা খুলে ফেলার পর কালো সায়া ও কালো ব্রা-তে তার ফর্সা শরীরটা মোহময় হয়ে উঠে। যেন সে কোনো প্রাচীন মন্দিরের দেবদাসী।

ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। ভাস্বতী রঞ্জনের কাছে এসে তার কাঁধের ওপর দু'হাত রেখে বললো, তুমি রাগ করেছ?

-- উঁহু বিহেভ্‌ড অ্যাজ ফুলস্। কিছু না জেনেশুনে এরকমভাবে আসা আমাদের উচিত হয়নি।

ভাস্বতী রঞ্জনের থুতনিটা টুক করে একবার কামড়ে দিয়ে বললো, এখন আর চিন্তা করে কি হবে? একটা তো থাকার জায়গা পাওয়া গেছে।

-- অচেনা লোকের কাছে থাকতে আমার ভাল লাগে না।

-- কত অচেনা জায়গায় তো আমরা থাকি।

-- সেখানে আমরা থাকি -- টাকা দিই, হুকুম করি। সে ব্যাপার আর এই ব্যাপার কি এক?

ভাস্বতী ম্লান গলায় বললো, তুমি এখন থেকে সব সময় আমার ওপর রাগ করে থাকবে বুঝি?

-- তোমার ওপর রাগ করবো কেন?

-- হ্যাঁ, করেছো তো!

রঞ্জন ভাস্বতীকে আলিঙ্গন করে বললো, তুমি একদম কথা শুনতে চাও না। এমন আসবার জন্য জেদ ধরলে?

-- আমার কিন্তু এখন বেশ ভালো লাগছে।

-- আজ সকাল পর্যন্ত তোমার মন খারাপ ছিল।

--সত্যি? বুঝতে পারি নি তো।

-- আমরা তো বেশ ভালোই আছি। শুধু শুধু তুমি কেন একটা বাজে দুঃখ পুষে রেখেছো?

-- আমার তো কোনো দুঃখ নেই।

ভাস্বতীর শরীরটা উষ্ণ। একটু -আধটু বিপদের গন্ধ পেলে ভাস্বতীর শরীর চাঞ্চল্য বাড়ে। সে রঞ্জনের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট পিষে দিতে লাগলো।

রঞ্জন বিরতি পেয়ে বললো, তাড়াতাড়ি করে নাও, ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

-- আমি ঐ পাজামা পরতে পারবো না।

-- সায়াটা একদম ভিজে । এরকমভাবে থাকতে নেই।

অন্ধকার ঘরখানায় কালো সায়া ও ব্রা-র জন্য ভাস্বতীর ফর্সা শরীরের খালি অংশগুলোই শুধু দেখা যাচ্ছিল। এবার সম্পূর্ণ শরীরটা দেখা গেল। সে বিশেষ রকমের সুবিধাভোগিনী, কারণ সে এরকম একটা নিখুঁত শরীর পেয়েছে। সম্পূর্ণ শরীরটা হেঁটে গেল খাটের কাছে, পাজামা ও গেঞ্জি তুলে নিয়ে পড়লো, তারপর বললো, চামড়ার ব্যাগের মধ্যে টর্চ আছে।

রঞ্জন টর্চের আলো ভাস্বতীর গায়ে ফেলে বললো, তোমাকে মজার দেখাচ্ছে।

টর্চের আলো দেখে বাইরে থেকে প্রসেনজিৎ বললো, একটা হ্যাজাক আছে, জ্বেলে নিতে পারেন।

ভাস্বতী বললো, আমি এইরকম ভাবে থাকবো? ওর সামনে বেরুবো?

রঞ্জন হাসতে হাসতেই বললো, কি আর করবে? গেঞ্জিটাও ফুটোফুটো -- ।

ভাস্বতী ওদের বড় তোয়ালেটা জড়িয়ে নিল গায়ে। তার মুখে লজ্জার চিহ্ন নেই, রয়েছে কৌতুক। নিজের শরীরটা নিয়ে সে বিব্রত বোধ করে না কখনো। কিন্তু তার একটু ঠান্ডা লেগে গেছে এরই মধ্যে - নাক সুলসুল করছে।

রঞ্জন দরজাটা খুলতে গিয়েও কি ভেবে থেমে গেল -- ফিরে এসে খাট থেকে রিভলবার সমেত বেল্টটা জড়িয়ে নিল কোমরে। তারপর দরজা খুলে বাইরে এলো।

প্রসেনজিৎ বাইরে বসে একটা স্টোভ জ্বালাবার চেষ্টা করছে। ভাস্বতী তাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কাছে অ্যাসপিরিন জাতীয় কিছু আছে? মুখ না ফিরিয়েই সে বললো, না। তারপর মুখ ফিরিয়ে ওদের নতুন পোশাক দেখে বললো, কি আর হবে। কোনোরকমে একটা রাত কাটিয়ে দেওয়া ।

-কাল নদীর জল কমবে ?

-যদি আবার বৃষ্টি না হয় ।

-আপনি এখানে একা থাকেন ?

-আমার সঙ্গে আর একজন লোক থাকে। তাকে বস্তারে পাঠিয়েছি। দু'তিনদিন পর ফিরবে।

ভাস্বতী জিজ্ঞেস করলো, এরকমভাবে একা একা থাকতে আপনার খারাপ লাগে না?

প্রসেনজিৎ স্টোভটা জ্বেলে সেটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভাস্বতীর মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললো, আমাকে প্রকৃতি-প্রেমিক ভাববেন না। এখানে থাকতে আমার খুবই খারাপ লাগে। শহরে থাকার আরাম -কথায় কথায় বাস বা ট্যাক্সি, সিনেমা , থিয়েটার, ভালো হোটেলে খাওয়া -এসব খুবই ভালো লাগে আমার। কিন্তু ভালো লাগলেই বা আমাকে দিচ্ছে কে ?

স্টোভটা নিয়ে প্রসেনজিৎ দ্বিতীয় ঘরখানিতে ঢুকে গেল। পেছনে পেছনে এলো ওরাও। এক পাশে কতকগুলো খাঁচা আর অন্য এক পাশে একটু রান্নার ব্যবস্থা । স্টোভটি নামিয়ে রেখে সে বললো, ভাত চাপিয়ে দিচ্ছি।বিশেষ কিছু আতিথ্য করতে পারবো না - এজন্য দুঃখিত।

রঞ্জন বললো, আমাদের কাছে পাঁউরুটি আর জেলি আছে। ভুলেই গিয়েছিলাম।

-সেগুলো এখন খেয়ে নিতে পারেন। রাত্তিরের জন্য ভাত, আলু আর পেঁয়াজ- সেদ্ধ। ঘি আছে টাটকা । ডিম ছিল, ফুরিয়ে গেছে।

ভাস্বতী বললো,,ঘি আর গরম ভাত তো চমৎকার !

-প্রত্যেকদিন খাবার পক্ষে খুবই একঘেয়ে। তা ছাড়া আর যখন কিছু নেই, তখন ভালো লাগুক আর খারাপ লাগুক-

–আমদের ভালো লাগবে। আমি কি আপনাকে রান্নায় সাহায্য করতে পারি ?

–সাহায্য করার কিছু নেই। আমি এক সঙ্গেই ভাত আর সেদ্ধ চাপিয়ে দেবো–

হিস হিস শব্দ শুনে চমকে গিয়ে রঞ্জন বললো, খাঁচাগুলোর মধ্যে কি সাপ আছে নাকি ?

–গোটা তিনেক মাত্র আছে। ভয়ের কিছু নেই। খাঁচা ভালো করে বন্ধ আছে। দেখবেন ?

টর্চের আলোয় দেখা গেল। দুটি সাপ নির্জীব হয়ে পড়ে থাকলেও একটি ফণা তুলে দাপাদাপি করছে। সেটা অন্তত হাত চারেক লম্বা, মাথার ওপর, প্রবাদ মতন, পায়ের ছাপ আঁকা।

–এইগুলো আপনি ধরেছেন ?

–হ্যাঁ

–ভাস্বতী বকুনির সুরে বললো, এগুলো নিজে ধরেন কেন ? সাপুড়ে কিংবা বেদেদের দিয়ে ধরাতে পারেন না?

প্রসেনজিৎ বললো, সাপুড়েরাই একমাত্র সাপ ধরতে পারে এটা পুরোনো ধারণা। কতগুলো টেকনিক আছে, শিক্ষিত লোকের পক্ষে সেগুলো শিখে নেওয়া আরও সহজ। সাইবেরিয়ার মাঠে যারা সাপ ধরে বেড়ায়, তারা প্যান্ট–কোট পরা সাহেব, অশিক্ষিত সাপুড়ে মোটেই নয়।

আমাদের ফ্যামিলির পশুপাখির ব্যবসা ছিল। এক সময় আমরা আমেরিকাতে হাতি চালান দিয়েছি পর্যন্ত। এখন সাপটাই বেশি প্রফিটেবল।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, কারা কেনে এই সব সাপ ?

–বোম্বের হপ্‌কিনস ইনস্টিটিউট। তা ছাড়া বিদেশের নানান লেবরেটরি কিংবা চিড়িয়াখানা। তবে এগুলো বাজে সাপ। ভালো দাম পাওয়া যায় পাইথনের। এই পাহাড় থেকে আমরা তিনটে পাইথন ধরেছি। আর একটা আছে– সেটা খালি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। সেটা ধরা হলেই আমার এ পাহাড় ছেড়ে কাছাকাছি অন্য একটা পাহাড়ে চলে যাবো। এদিককার পাহাড়গুলোতে বেশ ভালো পাইথন পাওয়া যায়।

রঞ্জন বললো, এ পাহাড়ে এখনো একটা আছে?

–হুঁ। সেটাকে দেখেছি দু' একবার। ধরা যায় নি। এই বর্ষার মধ্যেই ধরে ফেলতে হবে। শীত পড়লে আর পাওয়া যাবে না।

–যদি আমাদের গাছতলায় রাত কাটাতে হতো!

–সেটা খুব সুখের চিন্তা নয়।

–এই সব সাপখোপের মধ্যে আপনি যে একা একা থাকেন, আপনার ভয় করে না ?

–জীবিকার জন্য মানুষকে অনেক কিছু করতে হয়। শহরের কারখানায় ব্লাস্ট ফার্নেসে যারা কাজ করে, তাদের ভয় করে না ?

–আমরা বোকার মতন এখানে চলে এসেছি। আপনি না থাকলে আমরা বিপদে পড়তাম খুব।

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীর দিকে তাকিয়ে বললো, আপনাদের ভিজে কাপড়গুলো এ ঘরে মেলে দিন। এ ঘরটায় গরম আছে।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, এরকম অভিজ্ঞতা আপনার আগে হয়েছে ?

আর কেউ এ পাহাড়ে এসে এই ভাবে আটকা পড়েছে ?

–না।

ভাস্বতী উঠে চলে গেল পাশের ঘরে। রঞ্জনের প্যান্ট সার্ট এবং নিজের শাড়ীটা তুলে নিল। তার সায়া, ব্রা ও রঞ্জনের জাঙ্গিয়া নিতে ইতস্তত করলো একটু। অচেনা মানুষের সামনে এসব প্রদর্শন করা ঠিক সহবত নয়। কিন্তু অচেনা মানুষের সামনে সে কবে পাজামা, গেঞ্জি ও তোয়ালে গায়ে বেরিয়েছে?

অন্তর্বাসগুলো ও ঘরেই মেলে দিয়ে বাকি পোশাকগুলো নিয়ে খাঁচার ঘরে ফিরে এলো ভাস্বতী।

প্রসেনজিৎ একটা ডেকচিতে চাল ধুয়ে আলু পেঁয়াজ সমেত বসিয়ে দিল স্টোভে। তারপর একটা বাক্স থেকে ব্রান্ডির বোতল ও দুটি ষ্টিলের গেলাস বার করল। রঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার চলবে তো?

–রঞ্জন বললো, না, থাক্।

–আপত্তি আছে ?

–আপত্তি ঠিক নয়। আমি ওসব জিনিস একটু খেলে, তারপর বেশি না খেয়ে থাকতে পারি না। আপনার জিনিসে আমি ভাগ বসাতে চাই না। আপনার ফুরিয়ে যাবে–আপনি আবার কবে আনতে পারবেন, তার তো ঠিক নেই।

–আমার লোকটিকে আনতে বলে দিয়েছি। দিন দু'য়েকের মধ্যে এসে যাবে। যেটুকু আছে এখন খাওয়া যেতে পারে। আমি আগামী কালের জন্য চিন্তা করি না।

–না থাক।

প্রসেনজিৎ আর রঞ্জনকে পেড়াপীড়ি করলো না। ভাস্বতীর দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি?

ভাস্বতী বললো, আমি একটু চা খাবো।

প্রসেনজিৎ বললো, খুবি দুঃখিত । আমার চায়ের কথাটাই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। দাঁড়ান, আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি।

ভাস্বতী বললো, আপনি বসুন না। আমি তৈরি করছি–কোথায় কি আছে বলুন!

প্রসেনজিৎ বললো, দু' কাপ। আমার জন্য দরকার নেই।

অল্পক্ষণের মধ্যে চা বানিয়ে নিয়ে এলো ভাস্বতী। রঞ্জন এত আরাম করে জীবনে কখনো চা খায়নি। বৃষ্টিতে ভেজার পর গরম চা অপূর্ব লাগছে। তার আর একটু খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বলতে লজ্জা পেল।

চা খাওয়ার পরেই সিগারেটের জন্য রঞ্জনের দারুণ তৃষ্ণা। আবার প্রসেনজিতের কাছেই সিগারেট চাইতে হবে। ভারি লজ্জার ব্যাপার ।

ঠান্ডার জন্য হঠাৎ দু'বার হাঁচি দিয়ে ফেলে ভাস্বতী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। হাঁচি চাপতে গেলে আরও বেশি হাঁচি আসে।

রঞ্জন বললো, সতী, তুমি বরং একটু ব্র্যান্ডি খেয়ে নাও। তোমার ঠান্ডা লেগেছে, তোমার উপকার হবে।

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে একটা গেলাসে একটু ব্র্যান্ডি ঢেলে বললো, নিন্।

ভাস্বতী হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিল। ঠোঁটে একটুখানি স্পর্শ করে বললো, ভালোই লাগছে।

রঞ্জন প্রসেনজিৎকে বললো, আপনার সিগারেটে আমাকে ভাগ বসাতেই হবে। আমার সিগারেটগুলো ভিজে নষ্ট হয়ে গেছে।

ভাস্বতী বললো, চামড়ার কালো ব্যাগে আরও তো প্যাকেট আছে দেখলাম।

–তাই তো !

রঞ্জন লাফ দিয়ে উঠে পাশের ঘরে চলে গেল সিগারেট আনতে। খাঁচায় সাপটা এই সময় আবার হিসহিস করে উঠলো।

ভাস্বতী চোখ তুলে দেখলো প্রসেনজিৎ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার শরীরের দিকে। পুরুষের এই ধরনের দৃষ্টি তার গায়ে বেঁধে না, গা–সহা। এসব তার রূপের নৈবেদ্য, সে জানে।

প্রসেনজিৎ কোন কথা বলছে না। ভাস্বতীও কি বলবে বুঝতে পারছে না। অথচ এইরকম ভাবে দু'জনে কাছাকাছি বসে থেকে কথা না-বলার মধ্যে একটা অস্বস্তি আছে।

ভাস্বতী নিম্নস্বরে বললো, আমরা এসে পড়ে আপনাকে অনেক অসুবিধেয় ফেলালাম –

প্রসেনজিৎ বললো, এই কথাটা বলতে হয় বলেই বারবার বলছেন।

আমার কিন্তু আজ খুব ভালো সময় কাটছে আপনাদের জন্য । এই গাছপালা আর পাহাড় দেখতে দেখতে একঘেয়ে লাগে।

রঞ্জন দুটি সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে এসে বললো , ব্যাগে যে সিগারেট ছিল খেয়ালই করি নি। আপনি একটা প্যাকেট নিন।

প্রসেনজিৎ অবহেলার সঙ্গে প্যাকেটটা নিয়ে রেখে দিল এক পাশে।

ধন্যবাদ জানালো না। গেলাস হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলুন বাইরে বসা যাক। ভাত সেদ্ধ হতে দেরি আছে।

প্রসেনজিতের বাড়ির সামনে দিয়েই পাহাড়ী রাস্তাটা গেছে। রাস্তা থেকে তার বাড়িটা একটু উঁচুতে । রাস্তার ওপাশে একটা চওড়া মসৃণ পাথরে প্রসেনজিৎ জামা –কাপড় কাচে। এখন সেখানে পা ঝুলিয়ে বসাও যায় । নিচে খাদ ।

এই সব রাত্তিরে জ্যোৎস্না ফুটলে সুন্দর মানিয়ে যেত। কিন্তু আকাশে এখনো, থমথমে মেঘ, তারাদল সহ নিশাপতি অবলুপ্ত। মেঘ আছে, তাই হাওয়া নেই, গাছের পাতারা অচঞ্চল –একটা থমথমে ভাব। শুধু অবিরল শোনা যাচ্ছে নদীর শব্দ।

সিগারেট ধরিয়ে রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, এ পাহাড়ে কোনো শিকার টিকার পাওয়া যায় না?

গেলাস থেকে মুখ সরিয়ে প্রসেনজিৎ বললো, খরগোস আছে কিছু কিছু। কদাচিৎ দু' একটা বনমোরগ পাওয়া যায়। আর কিছু না । হিংস্র জন্তুটন্তু নেই।

–আপনার কাছে একটা রাইফেল রয়েছে দেখলাম ।

–ওটা রেখেছি লোকজনের ভয় দেখাবার জন্য।

–সে রকম কোনো ঘটনা কখনো ঘটেছে ?

–না। স্থানীয় লোকদের ধারণা আমি মন্ত্র পড়ে সাপদের বশ করতে পারি। চোর–ডাকাতরা আসে না, কারণ আমার কাছে তারা কিছুই পাবে না জানে।

ভাস্বতী বললো, জায়গাটা ভীষণ নির্জন। এখানে তো রাস্তা রয়েছে, তবু লোকজন আসে না?

–স্থানীয় লোকজন পারতপক্ষে এ পাহাড়ে আসতে চায় না, অনেক সময় কুলি–টুলি পাওয়া ও মুশকিল হয়।

–কেন, লোকজন আসে না কেন ?

–তার প্রধান কারণ সাপের ভয়। মন্দিরটা যখন প্রথম বানানো হয়–তখন পর পর দুজন পুরুত সাপের কামড়ে মারা গেছে। সেই থেকে আর কোনো পুরুত থাকে না। তা ছাড়া আস্তে আস্তে একটা সুসংস্কার তৈরী হয়েছে। লোকের ধারণা, এই পাহাড়ে ওপরে উঠলে কোনো মানুষ আর জীবন্ত ফিরে আসতে পারবে না। কারণ ঐ মন্দিরের কাছেই স্বর্গ।

–স্বর্গ?

–কেন, আপনারা শোনেন নি একথা ?

–না তো !

–শুনেছেন ঠিকই, বুঝতে পারেন নি। লোকে আপনাদের বলেছে, এই পাহাড়ের মাথায় হারাবুরু। বলে নি ?

–হ্যাঁ, ঐ রকম কথা শুনেছি।

–স্থানীয় আদিবাসীদের ভাষায় হারাবুরু মানেই স্বর্গ। এবং এটা খুব নতুন কথা কিছু নয়। হিন্দুদের যেমন ধারণা, হিমালয়ের কোনো একটা পাহাড়ের উপরে উঠলেই স্বর্গে পৌঁছানো যায়– কেউ বলে কৈলাস পাহাড়, কেউ বলে মহেন্দ্র পর্বত। তেমনি দক্ষিণ ভারত বা মধ্য ভারতের অনেক লোক যারা হিমালয় কখনো চোখে দেখেনি, দূরত্বও কল্পনা করতে পারে না।– তারা কাছাকাছি কোনো পাহাড়ের ওপরেই স্বর্গ কল্পনা করে।

এই পাহাড়টা স্থানীয় আদিবাসীদের নিজস্ব স্বর্গ। সেইজন্যেই স্বর্গের কাছে পৌঁছোলে আর ফিরে আসার প্রশ্ন ওঠে না। কেউ যেতে চায় না ।

যুধিষ্ঠিরের মতন স্বশরীরে স্বর্গে যাবার ইচ্ছে এদের নেই।

–আপনি ওর উপরে যান নি ?

–অন্তত দশ –বারো বার গেছি। সেই হিসেবে আমাকে দশ –বারো বার স্বর্গফেরত বলতে পারেন। ওখান থেকেই একটা পাইথন ধরেছি।

রঞ্জন চকিতে পিছনে ফিরে তাকালো । হঠাৎ তার মনে হলো চতুর্থ পাইথনটা বোধ হয় কাছাকাছি কোথাও আছে । থাকা অসম্ভব তো নয়। গা–টা শিরশির করে ওঠে।

অন্ধকার এখন একেবারে নিশ্ছিদ্র বলা যায় । পরস্পরের মুখ দেখা যায় না, শুধু সিগারেটের আগুন। এখন আর পোশাকের জন্য অস্বস্তির কারণ নেই ভাস্বতীর। একবার সে তোয়ালেটা সরিয়ে ফেলেছিল বুক থেকে–আবার অভ্যেসবশত ঃ আঁচলের মতন সেটা টেনে দেয়।

প্রসেনজিৎ আবার বললো, শীতকালে কিছু কিছু তীর্থযাত্রী এখানে আসে শুনেছি। তবে শীতকালে আমি এসব জায়গায় থাকি না। শীতকালে সাপ ধরার সুবিধে নেই। তখন আমি যাই জলা জায়গায় পাখি ধরতে।

–সারা বছরই আপনি পশুপাখি ধরে বেড়ান ?

অন্ধকারে অদৃশ্য হাসি হেসে সে বললো, আমার নাম তো প্রসেনজিৎ ।

আমার বন্ধুরা আমার ডাকনাম দিয়েছিল পশু। আমিও ওদেরই দলে।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, বিশেষতঃ শুধু শীতকালেই এখানে তীর্থযাত্রীরা আসে কেন ?

–কুসংস্কারের সঙ্গে বাস্তবজ্ঞান মেশানো। শীতকালে এই নদীটা শুকনো, মড়া হয়ে পড়ে থাকে। শীতকালে সাপের উপদ্রপ ও নেই –তারা গর্তে ঢুকে যায়, হাইবারনেশান পীরিয়ড তখন। ফসল ওঠার পর শীতকালে এখানকার লোকের হাতে কিছু টাকা থাকে–তাই এদের শাস্ত্রের নির্দেশ, শীতকালটাই তীর্থযাত্রার পক্ষে পুণ্য সময়।

–তখন মন্দিরে ওঠে ?

–না, সে পর্যন্ত যায় না। তাহলে যে আর ফিরবে না। মন্দিরের অনেক নিচ থেকে পুজো দেয়। মুরগীর গলা কেটে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয় ওপরের দিকে। বিশেষ করে বাঁজা মেয়েছেলেরা খুব আসে। এখানে পুজো দিলে নাকি তাদের সন্তান হয়, ওদের এরকম বিশ্বাস।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রসেনজিৎ ভাস্বতীকে উপলক্ষ করে তীব্র গলায় বলল, আপনিও তো সেই জন্যই এসেছেন? আসেন নি ? আপনার নিশ্চয় সন্তান হয় নি।

লোকটির কণ্ঠস্বর এখন একটু রুক্ষ মনে হলো। পুরুষ মানুষের এ ধরনের কণ্ঠস্বর শোনার অভ্যেস নেই ভাস্বতীর । সে কড়ে আঙুলের নখের ডগা ঠেকিয়ে এইসব পুরুষকে অবহেলা করতে পারে।

শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে ভাস্বতী বললো, না, আমি সে রকম কোনো বিশ্বাস নিয়ে আসি নি। এমনি কৌতূহলে এসেছি।

–সন্তান না হলে অনেক মেয়েরই মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমি জানি।

–আপনি ভুল জানেন।

সঙ্গে সঙ্গে গলা গরম করে প্রসেনজিৎ জিজ্ঞেস করলো, আপনাকে আর একটু ব্র্যান্ডি দেবো?

স্বামীর অনুমতি না নিয়েই ভাস্বতী বললো, দিন।

অন্ধকারে গেলাসে বোতলে ঠোকাঠুকি হলো। তরল পদার্থের শব্দ। গেলাসটা তুলতে গিয়ে ভাস্বতী দেখলো, তখনো তার গেলাস ধরে আছে প্রসেনজিতের আঙুল। ছোঁয়া লাগলেও প্রসেনজিৎ হাত সরিয়ে নিলো না।

ভাস্বতী সামান্য হেসে গেলাসটা তুলে নিল। বড় চুমুক দিল একটা। গলায় তরল আগুনের স্বাদ। স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে গিয়ে মাঝে মাঝে ভাস্বতী বিলেতী মদ্য পান করেছে। প্রথম প্রথম তার ইচ্ছে করতো না।

কিন্তু অফিসারের বউদের এরকম মানায় না। অবশ্য জিনিসটার স্বাদ ভালো না লাগলে সে অপরের হাজার অনুরোধেও খেত না। সংস্কার মানার ব্যাপারে তার খুব একটা জেদ নেই–কিন্তু নিজের ভালো লাগার কিংবা না–লাগার ওপর সে সব সময়ই জোর দেয়।

তোয়ালেটা বুক থেকে খুলে সে পাশে রেখে দিল এবার। যার ঠান্ডা লেগেছে, সে কেন অন্ধকারে আব্রু রক্ষার হাস্যকর চেষ্টায় বুকে ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে আছে এতক্ষণ? নিছক সমতল জীবনের অভ্যেস।

রঞ্জন বললো, তাহলে বোঝা যাচ্ছে, এখানকার আদিবাসীদের কাছে এটা একটা পবিত্র জায়গা। তাহলে —আপনি যে আছেন, কেউ আপত্তি করে না?

–আমি মধ্যপ্রদেশ সরকারের কাছ থেকে রীতিমত লাইসেন্স নিয়েছি। সাপগুলো ধরে উপকারই তো করছি এদের।

–কিন্তু এ কাজে আপনার জীবনের আশঙ্কা আছে।

–কোথায় নেই?

–নদীটার নাম সত্যিই বৈতরণী?

–মহকুমার ম্যাপেও সেই নামই আছে।

তিনজনই হঠাৎ একসঙ্গে চুপ করে গেল। যেন তিনজনেই উৎকর্ণ হয়ে কোনো শব্দ শুনছে। নদীর শব্দ ছাড়া আর শোনার মতন কিছু নেই। কথা বলতে বলতে এমন হয়, হঠাৎ একসঙ্গে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। স্তব্ধতা তখন গর্ভবতী।

একটু পরে একটু ছোট্ট হেসে প্রসেনজিৎ বললো, এখন আমাকে একবার ঐ নদীর কাছে যেতে হবে।

ভাস্বতী সেই মুহূর্তে তার কোমরের কাছে একটি হাতের স্পর্শ পেল।

হাতখানা তার কোমরের উপরে স্থির হয়ে রইলো। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, কিন্তু পুরুষের স্পর্শ চিনতে দেরি হয় না মেয়েদের। অন্ধকারে বহুবার রঞ্জনের হাত স্পর্শ করেছে ভাস্বতীকে, কিন্তু এই হাত অন্য। এই হাত রুক্ষ, অথচ এখন শান্ত।

ভাস্বতী সহজে বিচলিত হয় না কখনো। যে–কোনো অবস্থায় তার মনে হয় দেখাই যাক না এরপর কি হয়। সুতরাং সে শরীর কোঁকড়ালো না।

কিন্তু একটু বিস্মিত হয়ে সে ভাবলো, এই লোকটি কি নিছক অসভ্য ও বদ, না অন্য কিছু? প্রসেনজিৎ নদীতে যাবার নাম করে আকস্মিক ভাবে তাকে স্পর্শ করলো কেন?

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, কেন?

প্রসেনজিৎ বললো, আজ জল আনতে ভুলে গেছি।

–তা বলে এই অন্ধকারের মধ্যে জল আনতে যেতে হবে?

ভাস্বতী কোমরের ওপরের আগন্তুক হাতখানির ওপর নিজের হাত রাখলো। যেন অবাধ্য শিশুকে শাস্তি দিচ্ছে, এইভাবে নিঃশব্দে আঙুল তুলে মুচড়ে দিল। হাতখানা সরে গেল সেখান থেকে।

প্রসেনজিৎ বলল, সারা রাত কি তৃষ্ণা নিয়ে থাকা যায় ? ব্র্যান্ডি খেয়েছি তো, এখন আমার ভীষণ জলতেষ্টা পাবে। আপনাদের ও পাবে নিশ্চয়ই।

ভাস্বতী জিজ্ঞেস করলো, আপনি ঐ নদীর জল খান ?

–আর কোথায় জল পাব বলুন ? নদীর জলই তো একমাত্র সম্বল।

কখনো কখনো বৃষ্টির সময় পাত্র পেতে রাখি। কিন্তু বৃষ্টি তো নিয়মিত নয়

–আজ বালতি পাততেও ভুলে গেছি।

–তখন আমরা নদীর ধারে গেলাম।

–তখন তো আপনারা চলে যাবেন ভেবেছিলেন। আমি নিজের জন্য চিন্তা করতে ভুলে গেছি।

প্রসেনজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চলুন, দেখা যাক, ভাত সেদ্ধ হলো কিনা।

রঞ্জন পথ দেখাবার জন্য টর্চ জ্বাললো। এতক্ষণ সে একবারও খেলাচ্ছলেও আলো জ্বালেনি।

।।৫।।

খাঁচার সাপ তিনটেই এখন জেগে গেছে। অসহিষ্ণুভাবে নড়াচড়া করছে তারা। মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসছে লিকলিকে জিভ, ভারী নিশ্বাসের মতন ফোঁস ফোঁস শব্দ। সেদিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না, তবু রঞ্জন ও ভাস্বতীর সেদিকে চোখ চলে যায়ই।

প্রসেনজিৎ ভ্রুক্ষেপ করে না। ডেকচির ঢাকনা তুলে সে রান্না দেখে।

একটা হাতা দিয়ে খানিকটা তুলে একটা ভাত টিপে দেখে বললো, এখনো ঠিক সেদ্ধ হয়নি। ঢাকনাটা নামিয়ে রেখে বললো, এখানকার জলে সেদ্ধ হতে দেরি হয়।

আপনারা একটু দেখবেন। আমি জল নিয়ে আসছি।

একটা বড় প্লাস্টিকের বালতি তুলে নিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছিল । রঞ্জন তাকে বললো, দাঁড়ান।

প্রসেনজিৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বললো, কি হলো?

–আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে ।

–তার কোনো দরকার নেই।

ভাস্বতী বললো, একটা রাত জল ছাড়া চলবে না ? এখন আনতেই হবে ?

প্রসেনজিৎ খালি বালতিটা দেখিয়ে বললো, একবিন্দু জল ছাড়া কি সারা রাত কাটানো যায়?

–তাতে কি হয়েছে? মরুভূমিতে তো মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে কাটাতে পারে।

–কিন্তু কাছাকাছি জল আছে জানলে মানুষ জীবন তুচ্ছ করেও সেখানে যেতে চায়। আপনারা বসুন না, আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।

রঞ্জন উদ্বেল হয়ে উঠে। তার শোভনতার ধারণায় একটা কাঁটা ফুটছে।

এই লোকটির কাছে জোর করে আতিথ্য স্বীকার করিয়ে খানিকটা জুলুম করা হচ্ছে– তারপর এই সময় তাকে একা একা অতখানি পথ ভেঙে জল আনতে পাঠালে –সে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাবে। ভাস্বতীও তার দিকে তাকাবে নিচু চোখে।

সে দৃঢ়ভাবে বললো, আপনি একা যাবেন কেন ? আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে।

–তার কোনো দরকার নেই। শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন।

–না , তা হয় না।

রঞ্জন টর্চটা নিয়ে প্রসেনজিতের কাছে গিয়ে বললো, চলুন!

প্রসেনজিৎ ভ্রূ কুঁচকে ভাস্বতীর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, উনি একা থাকবেন?

রঞ্জন সমান ভাবে ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, তাতে কোনো ভয় আছে?

–এমনিতে কোনো ভয় নেই। আবার জোর করেও সে কথা বলা যায় না। অনেকে তো বিনা কারণেও ভয় পায়।

ভাস্বতী বললো, আমি ঠিক থাকতে পারবো।

প্রসেনজিৎ বললো, সেটা কিন্তু একটু রিস্কি হবে। একা থাকার অভ্যেস যাদের নেই, এ রকম নির্জন জায়গায় একা থাকা তাদের পক্ষে ঠিক নয়।

বিশেষত যে জায়গা কুসংস্কার দিয়ে ঘেরা–মেয়েদের পক্ষে সেখানে একা থাকা বিপজ্জনক।

ভাস্বতী বললো, আপনি মেয়েদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন মনে হচ্ছে!

প্রসেনজিৎ এবার একটু লজ্জা পেয়ে বললো, না, তা জানি না। আমি মেয়েদের তেমন ভাবে কখনো কাছ থেকে দেখিই নি। আপনি সত্যি ভয় পাবেন না?

ভাস্বতী লঘু ভাবে হেসে বললো, এখানে ভূত–টুত নেই তো?

–কি করে জানবো? তবে, এখানে কয়েকজন লোক মরেছে।

–ঠিক আছে। কিছু হবে না।

– তা হয় না।

প্রসেনজিৎ রঞ্জনের দিকে ফিরে খানিকটা নির্দেশ দেবার ভঙ্গিতে বললো, আপনি ওর কাছে থাকুন। আমি চট করে জল নিয়ে আসছি।

রঞ্জনের কাছে কথাটা আবার চ্যালেনজের মতন মনে হলো।দু'জন পুরুষের মধ্যে পারঙ্গমতার প্রশ্নে এই ভাব প্রায়ই এসে পড়ে। সে পাহাড় পছন্দ করে না। কিন্তু সে কাপুরুষ নয়। সে গম্ভীর ভাবে প্রসেনজিৎকে বললো, ঠিক আছে, আপনি থাকুন এখানে। আমিই জল নিয়েই আসছি।

–আপনি পারবেন না।

–কেন পারবো না। রাস্তা তো একটাই, হারিয়ে যাবার কোনো ভয় নেই। তাছাড়া টর্চ নিয়ে যাচ্ছি।

ভাস্বতী বললো, একটা পাইথন এখনো আছে।

রঞ্জন বলল, পাইথন কখনো তেড়ে এসে কারুকে কামড়ায় বলে কখনো শোনা যায় নি। দেখা হয়ে গেলেও আমি পাশ কাটিয়ে চলে আসবো।

বালতিটার দিকে সে হাত বাড়িয়ে বললো, দিন।

প্রসেনজিৎ বিনা বাক্যব্যায়ে বালতিটা রঞ্জনের হাতে তুলে দিল। আর বেশি বাধা দিয়ে সে রঞ্জনের পৌরুষে আঘাত দিতে চায় না।

ভাস্বতী প্রগাঢ় চোখে তাকালো রঞ্জনের দিকে। রঞ্জন একটু ইতস্তত করলো। এই নির্জন পাহাড়ী রাত্রে একজন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির কাছে নিজের স্ত্রীকে রেখে যাবার মধ্যে একটা মনোবেদনা থাকেই।

আবার, স্বার্থপরের মতন, সে তার স্ত্রীকে পাহারা দেবে, আর এই উপকারী লোকটি তাদের জন্য ভৃত্যের মতন খাটবে – এতেও সে নিচু হয়ে যায়।

রঞ্জনের মনে হলো, সেই নীরব প্রকৃতির মধ্যেও তার চারপাশে যেন হাজার হাজার দর্শক আছে। দর্শক কিংবা বিচারক। তারা তুলাদন্ডে বিচার করছে তার পৌরুষ ও সততা।

রঞ্জন মাটির দিকে মুখ করে একবার চোখ বুজলো। মনে মনে ভাবলো, আমার সারা জীবন ধরে আমি সবরকম ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করেছি। আকস্মিক দুর্বলতায় আমি নিচে নেমে যাবো না। দুর্বল পুরুষরাই সন্দেহ করে। ভাস্বতী তাকে ভালবাসে। অর্থাৎ পরস্পরের কাছে তারা এমন এক প্রকার আবেগে আবদ্ধ– যার ডাকনাম ভালোবাসা।

আর কোনো কথা না বলে রঞ্জন পেছন ফিরে নিচে নামার রাস্তা ধরলো। তার সামনে সামনে একটা আলোর বৃত্ত।

প্রসেনজিৎ তাকালো ভাস্বতীর দিকে। তার অবিন্যস্ত চুলগুলো ঝুলে পড়েছে কপালে । গেঞ্জির নিচে মেদহীন ইস্পাতের মতন শরীর।

জল নিয়ে ফিরে আসতে রঞ্জনের অন্তত দেড় ঘন্টা লাগবে।

প্রসেনজিৎ এক দৃষ্টে দেখছে ভাস্বতীকে। এর নাম শুধু চোখের আরাম নয়, তার দৃষ্টি শুয়ে আছে ভাস্বতীর শরীরে।

ভাস্বতী প্রসেনজিতের দিকে তর্জনী তুলে রানীর মতন অহঙ্কারী গলায় হুকুম করলো, আপনি যান ওর সঙ্গে , আমি একা থাকতে পারবো।

প্রসেনজিৎ বললো, আমি তো অনেকবার ওঁকে বললাম ।

ভাস্বতী বললো, আপনি জেনেশুনে আমার স্বামীকে বিপদের মুখে পাঠাচ্ছেন।

প্রসেনজিৎ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভাস্বতী ক্রীতদাসের কাছ থেকে কোনো কৈফিয়ত শুনতে চায় না। ফের হুকুম করলো, যান !

দাস –বিদ্রোহের নেতার মতন উদ্ধত ভাবে হাসলো প্রসেনজিৎ।

ভাস্বতীর পায়ের পাতা থেকে কপাল পর্যন্ত চোখ বোলালো। হাসলো আপনমনে। তারপর দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে রঞ্জনের কাছ থেকে বালতিটা কেড়ে নিয়ে বললো, আপনি আপনার স্ত্রীর কাছে থাকুন। উনি ভয় পেয়েছেন !

রঞ্জনকে সে আর কথা বলারও সুযোগ দিল না, তরতর করে ক্ষিপ্র পায়ে নেমে গেল নিচে । টর্চও সে নেয় নি, অবিলম্বে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

রঞ্জন অপ্রসন্নমুখে ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলো, তুমি ভয় পেয়েছো?

কিসে ?

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে ভাস্বতী বললো, ভয় পাইনি তো । এই সাপগুলোর কাছে থাকতে আমার বিচ্ছিরি লাগছিল।

রঞ্জন দেখলো, ভাস্বতীর পীনোন্নত স্তনদ্বয় ঘন ঘন নিশ্বাসে উঠছে নামছে। ভাস্বতী উত্তেজিত।

উত্তেজিত তো সে হবেই। কোনো নারী যখন কোনো পুরুষকে হুকুম করে, তখন সে একটা গভীর ঝুঁকি নেয়। হুকুম মানলে, সেই পুরুষ তার অহংকারকে সন্তুষ্ট করে। আর হুকুম যদি অবজ্ঞা করে, তবে আত্মসম্মানটুকু পর্যন্ত ধুলিসাৎ হয়ে যায় – তখন আর সে নারী থাকে না, একটা অসহায় প্রাণী, নিছক শারীরিক শক্তিতে দুর্বল ।

প্রসেনজিৎ তার কথায় বাধ্য হয়েছে, এখন তৃপ্ত ভাস্বতীর করুণার ছিটেফোঁটা সে পেলেও পেতে পারে।

রঞ্জনের কিন্তু ব্যক্তিত্ব একটু ক্ষুন্ন হয়েছে, সে উদারতা দেখাবার সুযোগ পায় নি।

সে অপ্রসন্ন ভাবটা বজায় রেখেই বললো, তুমি পাশের ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে থাকলেই পারতে। ছেলেটাকে একলা একলা পাঠানো ঠিক ভালো দেখালো কি !

ভাস্বতী অবহেলার সঙ্গে বললো, ও নিশ্চয়ই প্রত্যেকদিন কয়েকবার করে যায়। ওর কোনো অসুবিধে হবে না।

–তা হোক, আমাদের উচিত নয় ওকে এমন খাটানো । ও আমাদের জন্য অনেক করছে। এর বিনিময়ে আমরা কিছু দিতে পারবো কি ?

–কি আবার দিতে হবে! মানুষ মানুষের জন্য এরকম একটু করেই।

–তবু মানুষের কাছ থেকে এমনি এমনি কিছু নিতে আমার ভালো লাগে না। অনর্থক আমি কারুর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকা পছন্দ করি না।

এই কথা বলে রঞ্জন তার মুখের অপ্রসন্নতা কাটিয়ে একটু হাসলো।

তারপর বললো, অবশ্য মেয়েদের কথা আলাদা। মেয়েরা এমনি এমনিই অনেক কিছু পেতে অভ্যস্ত। সেবার তরফদার বিলেত থেকে ফেরার সময় তোমার জন্য একটা দারুণ দামী পারফিউম নিয়ে এলো। তুমি সেটা এমন ভাবে নিলে যেন সেটা তোমার প্রাপ্যই ছিল।

–আমি অনেকবার আপত্তি করেছিলাম।

–সেটা এমন ভাবে বলছিলে যে, বোঝাই যাচ্ছিল আসলে তোমার নেবার দারুণ ইচ্ছে এবং তুমি তোমার খুশি লুকোতে পারো নি। তরফদার বেচারা নিজের বোনকে না দিয়ে তোমাকে দিয়েই একেবারে গদ্‌গদ।

ভাস্বতী মুখ নীচু করে বললো, আমি সত্যিই নিতে চাই নি। কিন্তু কেউ যদি খুব বেশি জোর করে, তা হলে কি ভাবে না বলতে হয়, আমি জানি না।

রঞ্জন বললো, তাতে কি হয়েছে! নিয়েছো বেশ করেছো।

–সত্যি বলো না, নেওয়াটা আমার অন্যায় হয়েছিল?

–আরে, না, না, আমি এমনিই বললাম। তরফদার আমার বন্ধু লোক, সে তো তোমাকে একটা কিছুই দিতেই পারে।

–হাফলং–এর এরকম একটা বৃষ্টির দিনে তুমি কি করছিলে আমাকে বলবে না তো।

–সে এমন কিছু নয়।

গেঞ্জির তলায় অল্প ভাঁজপড়া তকতকে পেটে হাত রেখে ভাস্বতী শরীরে একটা আড়মোড়া দিল। তারপর বললো, এই সাপের ঘরে বসতে আমার ভালো লাগছে না। চলো পাশের ঘরটায় যাই।

রঞ্জন বললো, ভাতটা নামিয়ে ফেলো। হয়ে গেছে বোধ হয়।

ভাস্বতীর নিজের সংসার রাঁধুনি ও চাকরের হাতে। কদাচিৎ সে রান্নাঘরে ঢোকে, রান্নার পরীক্ষা নিয়ে সময় কাটাবার বদলে সে ব্যাডমিন্টন কমপিটিশানে মেডেল পায়।

তথাপি সে এখন চটপট হাতে ডেকচিটা নামিয়ে ফেলে ফেন গেলে এলো। একটি ভাত ও পড়লো না বাইরে। ডেকচিতে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়ে ভাতগুলো ঝরঝড়ে করে ফেলে সে ঢাকনা খুললো। আলুগুলো ফেটে ফেটে গেছে, পেঁয়াজগুলো এমন ভাবে গলে গেছে যে পাত্তাই পাওয়া যায় না। তবু গরম ভাতের সোঁদা গন্ধে ওদের ক্ষিদে চনমন করে ওঠে।

রঞ্জন বলে, ছেলেটা কতক্ষণ ফিরবে কে জানে। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

–আবার গরম করে নিলেই হবে।

স্টোভ নিভিয়ে দিয়ে ভাস্বতী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ছেলেটা বোধহয় পাগল, এই রকম জায়গায় কেউ একা একা থাকে? মনে তো হয় কিছু লেখাপড়া জানে, একটা কোথাও চাকরি পেতে পারতো না! তা না, এই বিদঘুটে ব্যবসা।

রঞ্জন উদারভাবে বললো, আমার অফিসেই একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। বলে দেখবো এখন একবার। কথাটা বলে রঞ্জন বেশ তৃপ্তি পায়। বাধ্য হয়ে যার কাছে আশ্রয় নিতে হয়েছে, যে এখন উপকারীর ভূমিকায় –তাকে অধস্তন কর্মচারী করে ফেলতে পারলে বেশ হয়। প্রতিনিয়ত প্রতিদানের কথাটা বোঝানো যায় অদৃশ্য ভাবে।

–না, তোমাকে বলতে হবে না। লোককে ডেকে ডেকে চাকরি দিতে হবে না। বেকারের কি অভাব আছে?

ভাস্বতী কথাটা বিরক্তির সঙ্গে বললেও তার মনোভাব অন্যরকম। আর যাই হোক, প্রসেনজিৎকে সে রঞ্জনের অফিসের একজন কেরানী হিসেবে ভাবতে চায় না। যদি সত্যিই কোনোদিন তা হয়, প্রসেনজিতকে সে সমতল ভূমির জগতে কেরানী হিসেবে কখনো দেখে–তবে,

এই লোকটাই একদিন নির্জন পাহাড়ে তার সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল–এই ভেবে ভাস্বতীর গা জ্বলে যাবে। এখান থেকে চলে যাবার পর সে প্রসেনজিৎকে আর কোনোদিন চোখে দেখতে চায় না। পাহাড়ের পরিচয় পাহাড়ে ফুরিয়ে যাওয়াই ভালো।

ভাস্বতী ভিজে পোশাকগুলোতে হাত দিয়ে দেখল। শুকোবার কোন লক্ষণ নেই। হাওয়া এখনও গুমোট। কিন্তু ব্রেসিয়ার ছাড়া রীতিমতন অস্বস্তি লাগছে তার। রাত্রে বিছানাতে ছাড়া আর সব সময় ব্রেসিয়ার পরে থাকা অনেকদিনের অভ্যাস। ব্রা এখনো ভিজে থাকলেও সে পরে ফেলা মনস্থ করে। রঞ্জন মৃদু আপত্তি তুললেও সে কানে তোলে না।

রঞ্জনের দিকে পেছনে ফিরে ভাস্বতী গেঞ্জিটা খুলে ফেললো, বিশাল 'ভি' অক্ষরের মতন তার ফর্সা পিঠ। কোথাও একছিটে মালিণ্য নেই, এইসব নারীর ঘাড়ে কখনো ময়লা জমে না। এই সব সৌন্দর্য প্রয়োজনের চেয়েও অতিরিক্ত মনে হয়– পাথরের মূর্তি হিসেবেই যেন বেশি মানায়। কেননা পাথরের মূর্তির নাম শিল্প– তখন তা বহুজনের দৃষ্টি গ্রাহ্য। যতক্ষণ তা রক্ত মাংসের, ততক্ষণ তা সীমিত। এবং জ্যান্ত সৌন্দর্য যতই তীব্র হোক, একজনের অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতায় তা পুরোনো হয়ে যাবেই। যেমন রঞ্জন আপাতত এই অর্ধনগ্ন নারীমূর্তির দিকে লোভীর মতন তাকিয়ে নেই, সে অন্য দিকে তাকিয়ে সিগারেট ধরিয়েছে এবং একটু অন্যমনস্ক।

ভাস্বতীর মুখ সাপের খাঁচার দিকে, ফণা তুলে দুলছে বড় সাপটা।

ওদের মাথা দোলানোই নাকি ওদের ভাষা।

–হুকটা আটকে দাও তো।

রঞ্জন উঠে ভাস্বতীর ব্রেসিয়ারের হুকটা পিছন দিক থেকে আটকে দিয়ে অভ্যেসবশত তার ঘাড়ে একটা চুমু খেল। তারপর কাঁধ ধরে তাকে নিজের সামনের দিকে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, তুমি এই ভাবেই থাকবে নাকি? এর ওপর গেঞ্জিটা পরবে না?

–পরতে হবে?

–তোমাকে এখন ভারী মজার দেখাচ্ছে। কার মতন দেখাচ্ছে বলবো?

–কার মতন?

–এসমেরাল্ডার মতন।

ভাস্বতী হাসলো কৌতুকে। তার সেই কোঁচকানো পাজামাও কালো ব্রেসিয়ার পরা শরীরটা দোলালো একবার। মাথার ওপর হাত দুটো বাঁকা ভাবে তুলে রঙ্গভরে বললো, নাচবো এসমেরাল্ডার মতন? তা হলে তো একটা পোষা ছাগল দরকার।

–ছাগলটা কল্পনা করে নাও।

ভাস্বতী দু'পায়ে ছন্দ তুললো একটু। এখন আর কোনো রকম দুশ্চিন্তা নেই। যেন হাজার চার পাঁচেক বছর পিছিয়ে ওরা আবার পাহাড়ী জীবনে ফিরে এসেছে। যেন ওরা শরীরের আব্রু সম্পর্কে অসচেতন মুক্ত গুহামানব।

কিন্তু মন আর সে রকম সরল হবেনা।

কথক নাচের শিক্ষা আছে ভাস্বতীর। কিন্তু যেহেতু ঘরটায় জায়গা খুবই কম এবং দর্শক মাত্র নিজের স্বামী এবং সামনের অন্ধকার ও পিছনের সাপ–তাই একটি মাত্র নাচের বোল তুলেই ভাস্বতী থেমে গেল।

এই অবস্থায় একটু স্তুতি ছাড়া জীবনে কোনো লাবণ্য থাকে না।

তাই রঞ্জন খানিকটা ঠাট্টা ও খানিকটা সত্যি মিশিয়ে বললো, সতী,

তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি চিরযৌবনা। তুমি সারাজীবন এই রকম থাকবে।

ভাস্বতীর মুখখানা হঠাৎ করুণ হয়ে গেল। সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো স্বামীর দিকে।

রঞ্জন আবার বললো, তোমাকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ঠিক বিয়ের আগেকার মতন। মনে হচ্ছে, তোমার বিয়েই হয়নি।

–কি হবে !

–তার মানে ?

–ভাস্বতী বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে হাত দুটি রেখে হঠাৎ কাতরভাবে বললো, আমি একটা সন্তান চাই। তাকে আমার বুকের ওপর চেপে ধরবো । আমার ভীষণ ইচ্ছে করে।

–সতী, আমার তো কোনো দোষ নেই।

–তবে কি আমার দোষ?

–সে কথা বলছি না।

–তা হলে কেন ? কেন ?

–সতী, তুমি আবার এই নিয়ে মন খারাপ করছো। আমাদের কথা ছিল না ই নিয়ে আমরা কখনো মন খারাপ করবো না।

–আমি যখন খুব ছোট্ট মেয়ে, তখন থেকেই আমি ভাবতাম, একদিন আমার একটি ছেলে হবে –আমি তাকে ভীষণ, ভীষণ আদর করবো। সে খুব দুষ্টু হবে, আমাকে জ্বালাতন করবে।

–আজ হঠাৎ এ কথা ভেবে মন খারাপ করছো কেন?

ভাস্বতী হাত দুটো নামিয়ে আনলো নিচে। রিক্তার মতন বললো, মন খারাপ করিনি। তুমি রাগ করো না।

–তোমাকে তো কতবার বলেছি, অনাথ আশ্রম থেকে একটা বাচ্চা এনে মানুষ করতে। নিজের সন্তানের মতনই মানুষ করবো। বিদেশে তো এরকম হরদম হয়।

–না, থাক। আর বলবো না।

রঞ্জন ভাস্বতীর সিংহিনীর মতন কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললো, পৃথিবীতে উত্তরাধিকার রেখে যাবার জন্য আমার তেমন আগ্রহ নেই। এ কি, তোমার শরীরটা কাঁপছে কেন ?

–কই, না, তো !

–চলো, ও ঘরে গিয়ে একটু বসি।

ক্যাম্প খাটে পা ঝুলিয়ে বসা খুব মুশকিল, পশ্চাদ্দেশ অনেকখানি নিম্নভিমুখী হয়ে যায়। সেই অবস্থাতেই বসার চেষ্টা করে, ওদের কৌতুকবোধটা খানিকটা ফিরে এলো ।

ভাস্বতী বললো, এখন কিন্তু বেশ লাগছে জায়গাটা ঐ ছেলেটার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমরা এখানে দু' তিনদিন তো থেকে গেলেও পারি।

রঞ্জন বললো, যদি আবার বৃষ্টি নামে, তা হলে বোধ হয় আমাদের বাধ্য হয়েই থেকে যেতে হবে।

তারপর মনে–পড়া গলায় রঞ্জন বললো, ভাগ্যিস গাড়িটা আনি নি।

–কেন, আনলে কি হতো ?

–গাড়িটা যদি নদীর ওপারে ফেলে রাখতে হতো, তা হলে কি আর সেটাকে খুঁজে পাওয়া যেত!

–এখানে কে আবার গাড়ি চুরি করবে ?

–তুমি জানো না, যেখানে কোনো মানুষজন থাকে না, সেখানেও গাড়িচোর থাকে। অন্তত কয়েকটা পার্টস তো খুলে নিয়ে যেতই।

–এখান থেকে ফিরে আমরা গাড়ি নিয়ে সেই লেকটা দেখতে যাবো।

–যেখানে অনেক পাখি আসে।

প্রসেনজিৎবাবুকেও আমরা ইনভাইট করতে পারি, যদি উনি রাজী হন।

ভাস্বতী একটু চিন্তা করে বললো, না, ওকে আর বলতে হবে না।

সেখানে শুধু আমরা দুজনে মিলে বেড়াবো । এই পাহাড়টাতেও যদি আমরা দুজনে শুধু থাকতাম, তাহলে আরও ভালো লাগতো।

রঞ্জন বললো, কোথাও সম্পূর্ণ নিরিবিলিতে থাকা যায় না, সব জায়গাতেই মানুষ।

উভয়ের কেউই ঠিক মনের কথা বলছে না এখন। বিয়ের পর প্রথম দু' তিন বছর শুধু স্বামী স্ত্রী মিলে বেড়াতে বেশ ভাল লাগতো। এখন দলবল থাকলেই বেশি ভালো লাগে। এবারেও রঞ্জনের অফিসের কলিগ মিঃ তরফদার এবং রঞ্জনের ঘনিষ্ট বন্ধু হীরেনের আসবার কথা ছিল, শেষ মুহূর্তে তারা আসতে পারে নি। তাতে ওরা বেশ দুঃখিত হয়েছে। বাংলোতে এসে প্রথম দু'দিন ওরা বারবার বলেছে, দুর, এবার কিছুই জমছে না। গতবার যা মজা হয়েছিল।- গতবার ওরা এসেছিল সাতজনের একটি দল।

একসঙ্গে বহু রাত্রি বাস করার পর নারী-পুরুষ আর সহজে নিরালা খোঁজে না। তবু যেন মনে হয়, এখনো কোনো ফাঁকা জায়গায় একটা কোনো আলাদা রহস্য অপেক্ষা করে আছে।

রঞ্জন বললো, ছেলেটা এই অন্ধকার রাস্তায় গেল-টর্চটাও নিয়ে গেল না। বেশি বেশি বীরত্ব দেখাতে চায়।

ভাস্বতী খুক খুক করে হেসে বললো, যখন ভাত চড়ালো, তখনও জলের কথা মনে পড়লো না ? তখনও একটু একটু আলো ছিল।

-যাই হোক ছেলেটা খারাপ নয়, মনে হচ্ছে । আমরা একেবারে না জেনেশুনে চলে এসেছি- বদমাশ লোকের পাল্লাতেও পড়তে পারতাম।

তখন নদীতে নেমে স্রোতের মধ্যে বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলাম-ছেলেটা সাহায্য না করলে বেশ মুশকিল হতো।

একটু থেমে রঞ্জন আবার বললো, আমি কি তোমাকে ওর কাছে রেখে জল আনতে গিয়ে ভুল করেছিলাম ?

ভাস্বতী দু' হাত দিয়ে রঞ্জনের গলা জড়িয়ে ধরে বললো, উঁহু ! রঞ্জন ভাস্বতীর ঘাড়ের কাছে চুমু খেয়ে লালচে দাগ করে দেয়।

ভাস্বতী রঞ্জনের বুকে অসম্ভব জোরে চেপে ধরে নিজের বুক।

এস খেলা। এর মধ্যে বাসনার তীব্রতা নেই। পরক্ষণেই পরস্পরকে ছেড়ে ওরা অন্য এক কাজে ব্যাপৃত হয়। রঞ্জন সিগারেট ধরায়, ভাস্বতী কালো ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে ভিজে চুল আঁচড়াতে আরম্ভ করে।

ভাস্বতী ভাবে, প্রসেনজিৎ অন্ধকারে ভাস্বতীর কোমরে হাত দিয়েছিল, একথা কি রঞ্জনকে জানানো দরকার ? স্বামী -স্ত্রী পরস্পরের কাছে শুদ্ধতার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যা পরে প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে, তা গোপন করার কথা নয়। কিন্তু এই ঘটনাটা বলে কি কোনো লাভ আছে? তাতে শুধু শুধু রঞ্জনের মন বিষিয়ে যাবে - এই রাত্রে তারা অন্য কোথাও তো চলে যেতে পারবে না। বলার দরাকার নেই। ছেলেটা দুর্বৃত্ত নয়, লোভী।

দুর্বৃত্ত হলে স্বামীর সাহায্যের দরকার, কিন্তু লোভী পুরুষদের মেয়েরা নিজেরাই সামলাতে পারে। কিংবা পারে না। এইসব রোমান্টিক লোভীরা গোপনীয়তা রক্ষা করে - এবং গোপনীয়তাই পবিত্রতার সিংহভাগ রক্ষাকবচ।

কিন্তু ভাস্বতী তার স্বামীকে কিছু জানাচ্ছে না - এই দেখে ছেলেটা যদি বেশি প্রশ্রয় পেয়ে যায়। যদি সে পাগল হয়ে ওঠে ? পুরুষদের এ রকম পাগল হতে তো ভাস্বতী অনেকবার দেখেছে। ভাস্বতীর হঠাৎ একটু মন খারাপ হয়ে যায়। এই রোমাঞ্চকর রাত্রি, এই স্তব্ধতা-এর মধ্যে ও কি তাকে সব সময় সর্তক হয়ে থাকতে হবে ? ভাস্বতীর কাছে নিয়ম নীতি তুচ্ছ-কিন্তু সে রঞ্জনের মনে কোনো আঘাত দিতে চায় না।

একদিন সন্ধেবেলা তরফদার এসেছিল, রঞ্জন তখন টুরে। চায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে তরফদারের মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গে বলে, আমি বিদেশ থেকে আপনার জন্য একটা পারফিউম এনেছি। আপনার নাম করেই সেটা কেনা –আপনি যদি না নেন ভাস্বতী হালকা ভাবে বলেছিল, নেবো না কেন? আমি পারফিউম খুব ভালোবাসি । কি পারফিউম ? আর কি কি এনেছেন ?

–আর কিছুই আনতে পারি নি। তিন সপ্তাহের প্রোগ্রাম, ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল– আসবার সময় প্যারিস এয়ারপোর্টে আপনার কথা হঠাৎ মনে পড়লো, তাই তাড়াহুড়োর মধ্যে শুধু একটা –

প্যারিসের এয়ারপোর্টে হঠাৎ ভাস্বতীকে তরফদারের মনে পড়ার কারণ কি ? এবং এই কথাটা তরফদার হালকা ইয়ার্কির ছলে বলে না–বেশ গুরুত্ব দেয়।

তরফদার রঞ্জনের থেকে একটু উঁচু পদে কাজ করে – সুতরাং রঞ্জনকে খুশি করার প্রশ্ন তার নেই। তরফদার অবিবাহিত।

ভাস্বতী বলেছিল, একটা মাত্র এনেছেন, তাহলে সেটা আমাকে দেবেন কেন ? সেটা আপনার বোন ছন্দাকে দিন। ও নিশ্চয়ই অনেক আশা করে আছে।

তরফদার ম্লানভাবে বলেছিল, ছন্দার জন্য কিছু একটা আনা উচিত ছিল ঠিকই, আবার পরের বার যখন যাব– না, না, এটাই ওকে দিন।

–সেটা হয় না, কেন জানেন, এটা কেনার সময় আপনার কথাই শুধু ভেবেছি। আপনি এটা একদিন মাখবেন, আপনার শরীরের গন্ধ আর পারফিউমের গন্ধ মিশে একদিন আমার নাকে লাগবে– এইসব কল্পনা করেছি প্লেনে বসে বসে। এটা শুধু একটা পারফিউম নয় – এর সঙ্গে আমার অনেকখানি কল্পনা মিশে আছে।

ভাস্বতীর মুখখানা আরক্ত হয়ে গিয়েছিল। এটা ঠিক স্তুতি নয়,আরও কিছু। কথাগুলির মধ্যে খানিকটা নির্লজ্জতা আছে। নিছক কাঁচা বয়েসের প্রেমিক ছাড়া মুখে কেউ এ রকম কথা বলে না। কিন্তু তরফদার এইসব কথা অনেকখানি ইংরেজি শব্দ মিশিয়ে বলেছিল। ইংরেজিতে অনেক কিছু চালানো যায়।

এ রকম কথা শুনতে ভাস্বতীর খারাপ লাগে না– কিন্তু রঞ্জন যদি সেখানে বসে থাকতো, তাহলে কি রঞ্জনের ভালো লাগতো কিংবা রঞ্জন উপস্থিত থাকলে কি তরফদার একথা বলতো? উপহার দেবার জন্য তরফদার কি বিশেষ করে এই সময়টা বেছে নিয়েছে ?

তরফদার ভদ্র এবং বিনীত ব্যক্তি। ফাঁকা ঘরেও সে কখনো দস্যুতা করবে না।

তরফদার অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে বলেছিল,. আপনি হয়তো অন্য কিছু ভাবছেন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলি। আপনাকে যতবার আমি দেখি একটু চমকে চমকে উঠি। তার কারণ হচ্ছে, আমার কলেজ জীবনে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল – তার সঙ্গে আপনার চেহারার খুবই মিল আছে। আপনাকে দেখলেই তার কথা মনে পড়ে।

–সেই মেয়েটি এখন কোথায় ?

–সে মারা গেছে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ভাস্বতী প্রশ্ন করেছিল, সেইজন্যই আপনি বিয়ে করেন নি ?

তরফদার অন্যমনস্ক হয়ে বলেছিল, ঠিক তা নয়। তবে, তাকে আমি ভুলতে পারি না। আপনাকে যতবার দেখি,–মানে, প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের এখানে এতবার আসি শুধু আপনাকে একটু দেখার জন্য, শুধু চোখে দেখে যদি কোনো মানুষ একটু শান্তি পায় –

তরফদারের কথা সত্যি নাও হতে পারে। মেয়েদের বশীভূত করার এটাও একটা প্রথা।—

ভাস্বতী জানে। তরফদারের কথা আন্তরিকই মনে হয়। তবু , এসব কথার মধ্যে একটা অপরাধবোধ আছে। তরফদার এ পর্যন্ত আর কোনো কিছুই করে নি- শুধু যেখানে যখন দেখা হয়েছে, উৎসুক ভাবে তাকিয়ে থেকেছে ভাস্বতীর দিকে –এবং ঐ কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছে।

পারফিউমটা সেদিন নেয় নি ভাস্বতী। তরফদারের সেটা দিতে হয়েছিল রঞ্জনের সামনে। রঞ্জন সেই ব্যাপার নিয়ে সামান্য খোঁচা মেরে কৌতুক করেছে ভাস্বতীর সঙ্গে, আর কিছু না । কিন্তু রঞ্জন জানে না, ঐ সুগন্ধের সঙ্গে তরফদারের কতখানি বাসনা মেশানো । ভাস্বতী সেকথা রঞ্জনকে বলতে পারে নি।

ভাস্বতী সিগারেটের ধোঁয়ায় বৃত্তের মধ্যে বসে থাকা রঞ্জনের দিকে তাকালো। ভুরু নিচু করে ভাবলো, না বলে কি কোনো অন্যায় করেছি?

ওরা দুজনে এমনিতে বেশ বন্ধু, তরফদারের ঐ দুর্বলতার জন্য দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করা কি

উচিত হবে ? রঞ্জন ভাস্বতীকে দেখে এখন একটু উষ্ণতা অনুভব করলো। ভাস্বতীর পা-জামার দড়ি একটু নেমে গেছে তলপেটের নিচে, ছোট্ট নাভি, কোমরের খাঁজ যেন মাখনের মধ্যে ছুরি বসিয়ে তৈরী করা। কালো ব্রেসিয়ারের নিচে কালো গিরিচূড়ার মতন দুই স্তন, কণ্ঠার হাড় সামান্য জেগে আছে, গলায় একটা সরু সোনার হার চিক চিক করছে, কানেও দুটো ছোট দুল। একটা হাত উঁচু করে চুলের গোছা ধরে থাকা, অন্য হাতে চিরুনি, শুধু তার চোখের দৃষ্টিই অন্যমনস্ক। ভাস্বতীর শরীরের অনাবৃত অংশ চামড়ার মসৃণতাই বেশি আর্কষণ করে।

রঞ্জন দু'হাত বাড়িয়ে বললো, এসো–আর একবার কাছে এসো।

এমন সময় বাইরে একটা শব্দ হলো। তেমন চমকায়নি ওরা, কেননা প্রসেনজিতের ফিরে আসার কথা। অথচ শব্দটা ঠিক মানুষের পায়ে চলার মতন নয়।

রঞ্জন ভাস্বতীকে বললো, গায়ে একটা কিছু জড়িয়ে নাও। তারপর সে সাবধানে দরজার কাছে দাঁড়ালো। পিস্তল চালাবার দক্ষতা আছে রঞ্জনের; কাশীপুর ক্লাবের সদস্য, সে সহজে বিচলিত হয় না।

টর্চের আলো ফেলে দেখলো আর কেউ নয়, প্রসেনজিৎই আসছে, কিন্তু তার ভঙ্গিটা অন্যরকম। জলের বালতিটা দু'হাতে ধরা, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, পা ঘষটে ঘষটে হাঁটছে। এতটা খাড়া পথে একটা ভারী জিনিস নিয়ে ওঠা সত্যি কষ্টকর। তাছাড়া প্রসেনজিতের পায়ে রক্ত।

।। ৬ ।।

রঞ্জন দৌড়ে গেল প্রসেনজিতকে সাহায্য করতে। জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে।

প্রসেনজিতের থুতনির কাছে অনেকটা কাটা, সেইখান থেকেই রক্ত ঝড়ছে বেশি। হাতে ও প্যান্টে সেই রক্ত।

বালতিটা নামিয়ে রেখে সে বললো, কিছু না পড়ে গিয়েছিলাম।

বৃষ্টির জন্য পাথর খুব পেছল হয়ে আছে।

–আপনাকে বললাম, আমি যাই।

–আপনি গেলে আরও মুশকিলে পড়তেন। রাত্তিরে পাহাড়ী রাস্তায় হাঁটা ডেঞ্জরাস। আমার অভ্যেস আছে, জল নিয়ে ফেরার সময় একটা সর্টকাট নিতে গিয়েছিলাম , সেই সময় হঠাৎ পড়ে গেলাম। এরকম ভাবে কখনো আমার পা পিছলোয় না। জলটাও পড়ে গিয়েছিলাম সব। তখন আবার নেমে গেলাম।

–দু'বার যেতে হলো?

–উপায় কি?

–আপনি টর্চটা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন না? আচ্ছা লোক তো !

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীর দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, এর জন্য উনিই দায়ী। উনি যে রকম ভাবে আমাকে যেতে হুকুম করলেন, আমি আর কিছুই ভাবার সময় পেলাম না।

কথাটাকে একটু মোলায়েম করার জন্য বলার শেষে সে একটু হাসলো।

রঞ্জন তাকালো ভাস্বতীর দিকে।

ভাস্বতী একটুও লজ্জা না পেয়ে ধমকের সুরে বললো, পাহাড়ী রাস্তায় চলাফেরা করার কিসে সুবিধে অসুবিধে সেটা আপনি বুঝবেন। সে কি আপনাকে আমি বলে দেবো ? নিন রক্ত ধুয়ে ফেলুন।

–বেশি জল খরচ করা চলবে না।

–তুলো–টুলো আছে?

প্রসেনজিৎ নিজেই কাঠের বাক্স থেকে তুলো স্টিকিং প্লাস্টার বার করলো। তাকে এসব রাখতেই হয়।

রঞ্জন বললো, একটু গরম জল করে ধুয়ে দিলে হতো না ?

প্রসেনজিৎ বললো, দরকার নেই। একটু খানি ব্রান্ডি লাগিয়ে দিলেই হবে। অ্যালকোহল অ্যান্টিসেপটিক।

একটা পাথরের কোণা ঢুকে গিয়েছিল নিশ্চয় প্রসেনজিতের থুতনিতে, বেশ খানিকটা গর্ত হয়ে গেছে। খুব যন্ত্রণা হবার কথা, কিন্তু মুখের একটি রেখাও তার বিকৃত নয়। ব্র্যান্ডির বোতল থেকে সে ঢকঢক করে খানিকটা চুমুক দিয়ে নিল।

ভাস্বতী বললো, আর কোথাও কেটেছে ?

–হাঁটুতে একটু চোট লেগেছে, এমন কিছু নয়। খানিকটা গড়িয়ে গিয়েছিলাম তো–

ভাস্বতী ক্ষতস্থানটা ভালো ভাবে পরিস্কার করে তুলো চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করতে লাগলো। প্রসেনজিৎ থুতনি উঁচু করে দাঁড়িয়ে ।

একজন আহত পুরুষের কাছাকাছি কোনো নারী থাকলে সে–ই যে পরিচর্যা করবে, এই তো জগৎ–সংসারের নিয়ম। এছাড়া নারীকে মানায় না। রঞ্জন একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে, ভাস্বতীর মন ও হাতে সেবায় রত। এই অবস্থাতেও যদি আলতোভাবে ভাস্বতীর পিঠের ওপর একটা হাত এসে পড়ে, তাহলে ভাস্বতী কি করতে পারে? সে কি প্রসেনজিৎকে ধাক্কা দেবে ? তার স্বামী এত কাছে দাঁড়ানো, তবু লোকটির এত দুঃসাহস ! সে কি এখন রঞ্জনকে বলবে যে এই স্পর্ধিত পুরুষটিকে শাস্তি দাও?

তারপর যদি রঞ্জন আর প্রসেনজিতের মধ্যে মারামারি শুরু হয়ে যায়, তখন কি মনে হবে না– একখন্ড মাংসের জন্য দুটি কুকুরের ঝগড়া? ভাস্বতীর দুঃখ হলো। তার শরীর কি শুধু মাংস?

ভাস্বতী গোপনে চোখ গরম করে প্রসেনজিতের দিকে তাকায়।

প্রসেনজিৎ তার হাত সরিয়ে নেয় না, তার ঠোঁটে সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম একটা হাসির আভাস। রঞ্জন যদি সব দেখে ফেলে, তাহলে সে ভাববে, এদের দুজনের মধ্যে একটা ষড়যন্ত্র আছে। ভাস্বতীর হাতের স্পর্শ পাবার জন্যই কি প্রসেনজিৎ থুতনি কেটে এসেছে ?

ভাস্বতী তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেলতে চাইছিল, রক্তভেজা তুলোটা সরিয়ে নিতে গিয়ে প্রসেনজিতের ক্ষতস্থানে একটা ধাক্কা লেগে যায়। রঞ্জন বললো, আঃ, সাবধানে করো, ব্যথা লাগছে না। ভদ্রলোকের ? প্রসেনজিৎ উঁ হু–হু–হু–হু শব্দ করে, কিন্তু আসলে সে হাসছে।

স্টিকিং প্লাস্টার লাগাবার পর ভাস্বতী সরে আসে, তার হাতে রক্ত লেগেছে। জল খরচের প্রশ্নটা মনে না রেখে ভাস্বতী ভালো করে হাত ধোয়।

খাঁচার বড় সাপটা বেশ জোরে কয়েকবার ফোঁস ফোঁস করে উঠতেই প্রসেনজিৎ চেঁচিয়ে উঠলো , চোপ্ বড্ড জ্বালাচ্ছিস! এবার দেবো এক ঘা- রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, ওরা কি খায়? বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে।

-সাপের ব্যবসার এই একটা সুবিধে। ওরা অনেকদিন না খেয়ে থাকতে পারে। আমার কিন্তু ক্ষিদে পেয়ে গেছে। আপনার পায় নি ?

-বসে পড়লেই তো হয়।

-প্রসেনজিৎ একটু খুড়িয়ে হাঁটছে। রঞ্জন সেটা লক্ষ করে বললো, আপনার পায়েও বেশ লেগেছে মনে হচ্ছে। হাঁটুতে লেগেছে? প্যান্টটা একটু গোটান না- দেখি।

-বিশেষ কিছু নয়।

-একা একা এরকম ভাবে থাকেন। হঠাৎ কখনো বেশি চোট লেগে যদি কিছু হয়-

-আমার সঙ্গে সাধারণতঃ একজন লোক থাকে। তাছাড়া -বাকি কথাটা শেষ না করে প্রসেনজিৎ হাসলো। অর্থাৎ ঐ হাসির মধ্যে বাকি কথাটা রয়েছে।

দুটি মাত্র চীনে মাটির প্লেট আর দুটি গেলাস, আর কোনো পাত্র নেই।

তিনজন এক সঙ্গে খেতে বসবে কি করে ?

ভাস্বতী আধুনিক সমাজের অন্তর্গত হলেও সে বাঙালী নারী । সে বললো, আপনাদের দুজনকে আগে দিই, তারপর আমি খেয়ে নেবো। প্রসেনজিৎ কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললো, তা কি হয় ! আপনারা আমার অতিথি। আপনারা বসুন, আমি পরিবেশন করছি।

রঞ্জনের ভাস্বতীর প্রস্তাবটাই পছন্দ। সে বললো, ঠিক আছে, ও-ই দিক না। আসুন আমরা বসি।

-দেখুন, আমি পাহাড়ী মানুষ,তা বলে কি একটু অতিথি সৎকারও করতে পারবো না?

রঞ্জন শুকনো ভাবে হেসে বললো, অতিথি? আমরা তো জোর করে আপনার কাছে-আর কোনো উপায় ছিল না -

প্রসেনজিৎ নম্রভাবে বললো, এ কি কথা বলছেন ! আমার এখানে একঘেয়ে জীবন, আপনারা যে এসেছেন, এ তো আমারই সৌভাগ্য। আপনাদের অনেক কষ্ট হবে -

এই প্রথম তার মুখ থেকে এরকম কথা শোনা গেল। এর আগে সে এই দম্পত্তির সৌজন্যসূচক কথার কোনো প্রতিউত্তর দেয় নি।

দুটি চটের থলি বিছিয়ে আসন পেতে দিয়ে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে সে রঞ্জনকে বললো, এতেই বসতে হবে, আমি খুব লজ্জিত।

-আরে না, না, কি বলছেন।

-আপনারা তা হলে বসে পড়ুন । এক কাজ করা যাক, আপনাদের দুজনকে প্লেটে বেড়ে দিয়ে আমি এই ডেকচিতেই খেয়ে নিচ্ছি। তাতে আপনাদের আপত্তি নেই তো ? দেখতে খারাপ লাগবে অবশ্য---

- ভাস্বতী বললো, আমিই ডেকচিতে নিচ্ছি।

-কালকেও যদি আপনাদের থেকে যেতে হয়-তাহলে আপনার কাল ডেকচি-

রঞ্জন চমকে উঠে বললো, কালকেও থাকতে হবে নাকি?

প্রসেনজিৎ হেসে বললো, এর মধ্যেই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন , তাই না ? নদীর জল কমা না কমা তো আমার হাতে নয়। যাই হোক, কাল যদি আপনাদের যেতেই হয়, আমি ব্যবস্থা করে দেবো। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লে পেছনের পাঁচ ছ' মাইল দুরের গ্রামটায় পৌঁছে যাবেন ন'টার মধ্যে। সেখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে -আরও আড়াই মাইল দুরে পাকা রাস্তা থেকে বাস পেয়ে যাবেন এগারোটার সময়। আমি আপনাদের বাসে তুলে দিয়ে আসবো।

–সে বাস কোথায় যায়?

–যায় ভূপালের দিকে। আপনারা মাঝখানে এক জায়গায় নেমে আপনাদের ডাকবাংলোর দিকে কানেকটিং বাস পেয়ে যাবেন।

রঞ্জন ফেরা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল, দেখা যাক, যদি ভালো লাগে, কাল থেকেও যেতে পারি। আমার স্ত্রীর সেই রকমই ইচ্ছে।

ভাত গরমই ছিল। প্রসেনজিৎ যে ঘি বার করলো, তা সম্পূর্ণ খাটি ও টাটকা। গরম ভাতে ঘি ও আলুসেদ্ধ–একেবারে অমৃতের স্বাদ।

প্রসেনজিৎ আবার তার সঙ্গে মিশিয়ে নিল শুকনো লঙ্কার গুরো, সে ঝাল ছাড়া খেতে পারে না–তার ভাতের রং লাল।

রঞ্জন বললো, এখন কিন্তু চমৎকার লাগছে। শুধু যদি আপনারা অ্যাকসিডেন্টটা না হতো–

–এ সামান্য ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করবেন না।

–শহরের জীবন আমাদের কাছেও একঘেয়ে লাগে। মাঝে মাঝে যদি এ রকম জায়গায় এসে থাকা যায় –বিদেশের ছেলেমেয়েরা তো প্রায়ই যায় – একটা তাঁবু সঙ্গে নিয়ে আর সামান্য কিছু জিনিসপত্তর –আমরাও ইচ্ছে করলে– অবশ্য এ পাহাড়টায় যে সাপ আছে বলছেন –

–আর বেশি নেই। আমি প্রায় শেষ করে এনেছি।

ভাস্বতী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন?

মাটির দিকে চোখ রেখে প্রসেনজিৎ বললো, আমার বাবা বেঁচে আছেন এখনো– কাজকর্ম কিছু করতে পারেন না– তিন দাদা আছে, সকলেই আলাদা, মা মারা গেছেন আমার এক বছর বয়েসে–

–আপনি এ রকম ভাবে কতদিন থাকবেন?

–কোনো পরিকল্পনা নেই। যতদিন চলে–

ভাস্বতী প্রসেনজিতের চোখ দুটি খোঁজার চেষ্টা করে, কিছু পায় না।

প্রসেনজিৎ অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। মাত্র এক বছর বয়েসে মা মারা যাবার কথাটা ও এত নিস্প্রাণ গলায় বলে কি করে? মাতৃস্নেহে বঞ্চিত পুরুষরাই বুঝি এরকম নির্জন পাহাড়ে সাপ ধরার ব্যবসায় নিযুক্ত থাকতে পারে।

আপনার শহর ভালো লাগে না?

প্রসেনজিৎ এবার হাসলো। চোখ আনলো ভাস্বতীর দিকে। তারপর বললো, আপনাকে বলেইছি, ভালো খাবারদাবার, ভালো বিছানা এবং অন্যান্য আরাম পেলে আমার খুবই ভালো লাগতো। এসব কে না চায়?

কিন্তু আমি এসব পাইনি।

–চেষ্টা করেছিলেন?

–আমি আমার নিজের জীবনের গল্প আপনাদের শোনাতে চাই না।

ভাস্বতী হুকুমের সুরে বললো, আমি শুনতে চাই।

রঞ্জন দরজার দিকে তাকিয়ে বললো, ওটা কি? এই সতী, সরে যাও, সরে যাও–

ভাস্বতী চমকে গিয়ে খাবারের প্লেট উল্টে ফেলছিল আর একটু হলে। তাকিয়ে দেখা গেল এমন কিছু নয়, একটা ব্যাঙ।

পাহাড়ী ব্যাঙ যে রকম হয়, মেটে–মেটে রং, তেলতেলে গা, জুলজুলে চোখে লাফিয়ে ঘরে ঢুকছে।

প্রসেনজিৎ বললো, এইবার দেখুন একটা মজা। খাঁচায় সাপ আছে, তবু ব্যাঙটা ঐ দিকেই যাবে। এ রকম বোকা জীব আর নেই।

ব্যাঙটা সত্যি সত্যি লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে লাগলো খাঁচাগুলোর দিকে। স্বামী স্ত্রী দুজনে আড়ষ্ট ভাবে সেই দিকে তাকিয়ে। বড় সাপটা চিড়িক চিড়িক করে জিভ বার করছে। ব্যাঙটা খাঁচার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে ফোঁস ফোঁসানি শুনে খেয়াল করলো। তখনই পেছনে ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে দিল এক পেল্লায় লাফ। প্রসেনজিৎ হো হো করে হেসে উঠলো

ব্যাঙটা পালাবার আগেই প্রসেনজিৎ একটা কাঠি দিয়ে সেটাকে ঠেলা মেরে ছুড়ে দিল খাঁচার দিকে। সাপটা ছোবল মারলো– কিন্তু জালের বাইরে ব্যাঙটাকে ধরতে পারলো না।

ব্যাঙটা মাটিতে উল্টে পড়লো চিৎপটাং হয়ে। দেখা গেল তার সাদা পেট। প্রাণপণে সোজা হয়েই সে আবার লাফ দেবার জন্য উদ্যত হলো,

প্রসেনজিৎ সেটাকে আবার খাঁচার দিকে ঠেলে দিতে গেল।

ভাস্বতী বললো, করছেন কি ?

প্রসেনজিৎ সে কথা শুনলো না । ব্যাঙটাকে সে খাঁচার সঙ্গে চেপে ধরতে যাচ্ছে।

ভাস্বতী প্রসেনজিতের হাত চেপে ধরে কাঠিটা সরিয়ে দিয়ে বললো, কি হচ্ছে কি, ছেড়ে দিন ওটাকে, বিশ্রী–ব্যাপার আপনার একটু ইয়ে নেই!

সামান্য একটু অবসর পেয়েই ব্যাঙটা পালাতে শুরু করেছে, প্রসেনজিৎ পা দিয়ে সেটাকে সুট করে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বললো, যা –!

তারপর ভাস্বতীর দিকে ফিরে বললো, আপনি বেচারা সাপটাকে খেতে দিলেন না। আপনি এত বিচলিত হচ্ছিলেন কেন? জীব–জগতের নিয়মই তো এই, একজন আর একজনের ওপর নির্ভর করে বাঁচবে।

–তবু চোখের সামনে দেখতে বিচ্ছিরি লাগে।

–আপনারা শহরে থাকেন, আপনাদের এসব চোখে পড়ে না। অথচ প্রকৃতিতে এটা সব সময় ঘটছে–দেখে দেখে আমাদের গা–সহা হয়ে গেছে। একদিন দেখলাম একটা পাপিয়া –'বউ কথা কও' যাকে বলে বাংলাদেশে –ভারি সুন্দর দেখতে হয় পাখিগুলো –সেই একটা পাখিকে একটা সাপ ধরেছে গাছের ওপর ওঠে –আমার হাতে চিমটে ছিল–একবার ভাবলাম তক্ষুনি সাপটাকে ধরি– কিন্তু আমার সঙ্গে হরদয়াল বলে যে লোকটা থাকে, সে বললো, সাহেব , একটু থাক না– বেচারা সাপটা শেষ বারের মতন প্রাণ ভরে খেয়ে নিক, পাখিটা তো আর বাঁচবে না – আমিও তাই একটু অপেক্ষ করলাম–

–দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন সেখানে ?

–সাপটাকে তো আর পালাতে দেওয়া যায় না। আশ্চর্য কায়দায় ওরা কিন্তু পালকগুলো বাদ দিয়ে খেতে পারে। শুনতে আপনার খারাপ লাগছে !

–হ্যাঁ।

–কিন্তু এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আপনাদের শহরেও এরকম হয়, কিন্তু একটু আরু থাকে। সেখানেও তো একদল মানুষকে তিল তিল করে মেরে আর একদল মানুষ ভোগ করে –তাই না! আমি যখন শহরে চাকরি খুঁজতে গিয়েছিলাম, তখন আমারও এই ব্যাপার হয়েছিল। আমিও কিছু স্বার্থসর্বস্ব লোকের শিকারে পরিণত হচ্ছিলাম। যাক গে সে কথা। ব্যাপারটা হচ্ছে, সভ্য জগতেও এই সাপ আর ব্যাঙের ব্যাপারটা চলছে., কিন্তু সেটা সহজে বুঝতে দেওয়া হয় না, বিশেষতঃ মেয়েদের–

–রঞ্জন বললো, ঠিকই বলেছেন, এই রকম চলে আসছে।

–দয়া মায়া এইসব শব্দগুলো স্থান কাল বিশেষে এক এক রকম।

অনেক শহরেই দেখবেন পশু ক্লেশ নিবারণ সমিতি আছে– খুব মহৎ ব্যাপার–কিন্তু সেই সব শহরেই কত বাচ্চা ছেলেমেয়ে ভিক্ষে করে– ঐ সমিতির কাছে তার খবর পাবে না।

BDeBooks.com

রঞ্জন বললো, আমরা এখানে পেট পুরে খেলাম । আর ঐ সাপ বেচারার ডিনার নিজে নিজেই ওর কাছে এসে হাজির হলো – তাও আমরা খেতে দিলাম না। বুঝলে সতী, একে ঠিক জীবে দয়া বলে না।

ভাস্বতী বললো, আমার আর এখানে একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।

–কেন ?

–আমার এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

–একটা ব্যাঙ দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল ?

–চুপ করো তো একটু !

–তুমি যে বলেছিলে এইরকম একটা পাহাড়ী জঙ্গলে বাড়ি বানিয়ে থাকবে ?

–উনি বোধ হয় ভেবেছিলেন, সব জঙ্গলই তপোবনের মতন শান্ত স্নিগ্ধ জায়গা। কিছুক্ষণের জন্য এলে তা –ই মনে হতে পারে। কিন্তু জঙ্গল মানেই হিংসার রাজত্ব। দেখলেন না, একটা সামান্য নদী পর্যন্ত কতখানি বিপজ্জনক হতে পারে।

স্বামী ও অপর পুরুষটির কথার মধ্যে একটু ব্যঙ্গের আভাস ছিল। ভাস্বতী তার প্রতি এই সুরে কথা বলা পছন্দ করে না। দুজেনই যেন তাকে লক্ষ করে বক্তৃতা দিচ্ছে।

সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে গেল বেশ খানিকটা।

রঞ্জন তাড়াতাড়ি চলে এলো তার পেছন পেছন। ভাস্বতীর হাত ধরে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করলো, এই সতী , কি হলো কি ?

ভাস্বতী কঠিন গলায় বললো, কিছু না।

–কোথায় যাচ্ছো, কোথায় ?

–কোথাও না।

–হঠাৎ রেগে গেলে কেন, কি হয়েছে ?

–কিছু হয় নি তো।

মেয়েদের রাগের কারণ বুঝতে না পারলে পুরুষদের মুখ যে রকম অসহায় হয়ে যায়, সেই রকম মুখে দাড়িয়ে রইলো রঞ্জন ।

আবার মেয়েদের রাগ ভাঙানোটাও পুরুষদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

একটি মেয়ে রাগ করেছে, তার পাশে যদি একজন পুরুষ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে ধরে নিতে হবে যে পুরুষটি রাগ করেছে। কিন্তু রঞ্জন তো রেগে যায় নি। সুতরাং ভাস্বতীর রাগের কারণ না জেনেও তাকে বলতে হবে, লক্ষীটি, রাগ করো না।

ওদিকে ঘরের মধ্যে মৃদু মৃদু হাসিমুখে মাটি থেকে খুঁটে খুঁটে এটো তুললো প্রসেনজিৎ। তারপর বাসনপত্তর নিয়ে বাইরে এলো

রঞ্জন তা দেখে একটু বিব্রত হয়ে বললো, এ কি ' আপনিই নিয়ে এলেন! সতী, তোমার উচিত ছিল একটু সাহায্য করা।

প্রসেনজিৎ বললো, এখন মাজা –ঘষা করছি না। এমনি রেখে দিচ্ছি বাইরে –বৃষ্টি এলে ধুয়ে যাবে। গেলাস দুটো শুধু ধুয়ে রাখছি। আসুন, আঁচিয়ে নিন।

ভাস্বতী ফিরে এলো জলের কাছে।

রঞ্জন ঘড়ি দেখে বললো, মাত্র সাড়ে আটটা বাজে। মনে হয় যেন অনেক রাত ।

অন্যদিন এই সময় তারা রেকর্ড প্লেয়ার শোনে অথবা সিনেমায় যায়, অথবা বন্ধুবান্ধবের বাড়ি। সাড়ে দশটা –এগারোটার আগে কোনোদিন খাওয়া হয় না। এমন কি , গতকাল রাত্রেও রঞ্জন আর ভাস্বতী ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে রাত বারোটা পর্যন্ত গল্প করছে। গল্প মানে অবশ্য অনেকটাই পরচর্চা ।

রঞ্জন বললো, এক্ষুণি কি শুয়ে পড়া হবে ?

প্রসেনজিৎ বললো, ইচ্ছে হলে আমরা তিনজনে একটু বেড়িয়ে আসতে পারি।

তারপর একটু চিন্তা করে প্রসেনজিৎ বললো, নাঃ, তার দরকার নেই।

রাস্তা খারাপ। আবার হাত –পা ভাঙতে পারে।

–আপনি অন্যদিন এই সময় কি করেন?

–আমি কি করি? কিছুই না। সন্ধে থেকেই খাওয়াদাওয়ার যোগাড়, তারপর খাওয়া, তারপর শুয়ে পড়া– মধ্যবিত্তদের মতন বইটই পড়ারও অভ্যেস আমার নেই।

–মধ্যবিত্তরাই বুঝি শুধু বই পড়ে?

–আমি বলতে চেয়েছি, ঐ অভ্যেসটা মধ্যবিত্তদেরই থাকে। আমি গরীব লোক, আমার বই পড়ার প্রয়োজন হয় না।

–আপনি তো গানটান করেন।

–আমি ?

–ভাস্বতী বললো, আমরা আপনার গান শুনেছি ' যেদিন সুনীল জলধি হইতে' –

প্রসেনজিৎ হেসে ফেলে বললো, সে গান এই বোবা পাহাড় আর গাছপালা সহ্য করতে পারে – কোনো সভ্য মানুষের কান সহ্য করবে না।

নেহাত একঘেয়েমি কাটাবার জন্য। আপনি গান জানেন না?

ভাস্বতী রঞ্জনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, ইনি জানেন–

গানের ব্যাপারে প্রথমে মেয়েদের কথাই মনে পড়ে। প্রসেনজিৎ তাই একটু অবাক হয়ে ভাস্বতীর দিকে তাকায়। কিন্তু ভাস্বতীর ঠিক গানের গলা নেই। সেই জন্যেই সে ছেলেবেলা থেকে নাচ শিখেছে। রঞ্জন বরং বেশ ভালোই গান গায়। নিজের বিবাহ বাসরে সে পর পর সাতখানা গান গেয়ে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিল।

রঞ্জন বললো, এক কাজ করলে তো হয় – আমরা তো সারা রাত গান গেয়ে আর গল্প করেও কাটিয়ে দিতে পারি। অন্তত যতক্ষণ পারা যায় –

প্রসেনজিৎ বললো, তা হতে পারে । কিন্তু তা হলে আমাদের অন্ধকারের মধ্যে বসতে হবে। হ্যাজাকটা বেশিক্ষণ জ্বেলে রাখতে পারবো না। এই একটা ব্যাপারে আমি কৃপণ। হ্যাজাকের তেল বেশি নেই– এখানে পনরো কুড়ি মাইলের মধ্যে তেল পাওয়া যায় না।

রঞ্জন বললো, শুধু শুধু জ্বেলে রাখার তো দরকার নেই।

অন্ধকারের মধ্যে কাছাকাছি বসে গল্প করার প্রস্তাবটা ভাস্বতীর পছন্দ হয় না। সে বলে, আমি একটু বাদে শুয়ে পড়বো। আমার ঘুম পাচ্ছে।

প্রসেনজিৎ বললো, আসুন, আগে শোবার ব্যবস্থাটা করে ফেলা যাক। তারপর যদি গল্প করতে ইচ্ছে হয়–

এবার শোওয়ার ব্যবস্থা।

এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাস্বতী আর রঞ্জন আলাদা ভাবে অনেকক্ষণ ধরেই চিন্তা করছিল। কেউ কিছু বলে নি। শোওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?

দুটি মাত্র খাট – কিন্তু ফোল্ডিং ক্যাম্প খাট এমনই ছোট ও গড়ানে ধরনের হয় যে,তার একটাতে দুজনের পক্ষে শোওয়া একেবারে অসম্ভব।

রঞ্জন তবু সেই অসম্ভব প্রস্তাব করলো, একটা খাটে আমরা দু'জনে শুচ্ছি–আর একটা আপনি নিন।

প্রসেনজিৎ বললো, এক খাটে দু'জনে ? দু'জন বাচ্চা ও শুতে পারে না, মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যায়।

–সে আমরা ঠিক চালিয়ে নেবো

–অবাস্তব কথা বলে কোনো লাভ নেই। ও রকম ভাবে শোওয়ার চেয়ে না–শোওয়া অনেক ভালো। আপনারা দুজনে দুটো খাট নিন। রান্নার জায়গাটাতে আমার ব্যবস্থা করে নেবো।

রঞ্জনের উন্নত হৃদয় এই স্বার্থপর ব্যবস্থায় কিছুতেই সম্মত হতে পারে না।

সে দৃঢ়ভাবে বলে, তা কখনো হয়! তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্। খাট দুটো সরিয়ে মাটিতে একটা কিছু বিছিয়ে আমরা তিনজনেই তো শুতে পারি।

রঞ্জনের কথায় একটু আতিশয্যের সুর আছে। ভাস্বতী তাকালো রঞ্জনের দিকে। ওরকমভাবে শুতে ভাস্বতীর আপত্তি নেই, সামাজিক নীতি সে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু প্রসেনজিতের হাত? ঐ দুরন্ত হাত কে রুখবে?

রঞ্জনকেই দুঃখ দেওয়া হবে তাতে।

সে মানিনীর মতন গলায় আণুনাসিক আদুরে সুর ফুটিয়ে বললো, আমি বাবা মাটিতে শুতে পারবো না। আবার যদি ব্যাঙ –ট্যাঙ আসে –

রঞ্জন প্রসেনজিতের দিকে তাকিয়ে পুরুষদের নিজস্ব ধরনে সহাস্য দীর্ঘশ্বাস ফেললো, যার অর্থ, মেয়েদের নিয়ে আর পারা যায় না।

তারপর সে বললো, ঠিক আছে,ও একটা খাট নিক। আপনি আর আমি মাটিতে শুই। একটা রাত কেটে যেতে কতক্ষণ।

প্রসেনজিৎ বললো, একটা খাট খালি রাখার কোনো মানে হয় না। আপনারা দু'জনে এ ঘরে থাকুন। আমি পাশের ঘরটায় আমার ব্যবস্থা করে নিচ্ছি । কোনো অসুবিধে হবে না।

–ঐ সাপের ঘরে আপনি শোবেন?

–মেছুনির যেমন মাছের গন্ধ ছাড়া ঘুম আসে না, আমারও তেমনি সাপের ফোঁসফোঁসানির শব্দ ছাড়া ঘুম আসে না। অবশ্য ঐ শব্দ আপনাদেরও শুনতে হবে।

–তা হয় না।

অনেক তর্কাতর্কি করেও প্রসেনজিতের মত বদলানো গেল না। বস্তুত, সে যা বলছে, এইটাই একমাত্র উপযুক্ত ব্যবস্থা। তার ব্যবস্থার মধ্যে কোনোরকম কুমতলব নেই দেখে ভাস্বতীই বরং একটু অবাক হয়।

রঞ্জন অতিরিক্ত কৃতজ্ঞতার ভাবে প্রায় কাতর গলাতেই বলে, কিন্তু এটা কি রকম দেখায় বলুন তো–আমরা দু'জন আরাম করে খাটে শোবো – আর আপনি ঐ সাপের ঘরে মাটিতে –

সরলভাবে হেসে প্রসেনজিৎ বললো, একদিন না হয় আমাকে একটু আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিলেন ।

এ যদি কোনো ডাকবাংলোর চৌকিদার হতো, তাহলে রঞ্জন এক্ষুনি একে পঁচিশ টাকা বকশিশ দিয়ে ফেলতো। কিন্তু বিনিময়ে একে কিছুই দেওয়া যাচ্ছে না। –এতে রঞ্জন মনে মনে খুবই বিব্রত বোধ করে।

খাটের ওপর যে সামান্য বিছানা ও বালিশ ছিল, রঞ্জন তা কিছুতেই নেবে না। তা প্রসেনজিতকে নিতে হবেই। রঞ্জন বললো, সতী ,তুমি প্লিজ ওর বিছানাটা পেতে দিয়ে এসো।

ভাস্বতী ততক্ষণে একটা খাটে শুয়ে পড়েছে। হাত ছড়িয়ে আরাম করে বললো, আঃ!

তারপর বললো, আমার আর এখন উঠতে ইচ্ছে করছে না।

রঞ্জনের ভদ্রতাবোধ এত বেশি যে সে প্রসেনজিতের কাছে কৃতজ্ঞতার বোঝায় কিন্তু কিন্তু হয়ে আছে।

সে বললো, ওরকম করো না। ছেলেটি এত কিছু করছে আমাদের জন্য

–এটা ভালো দেখায় না।

ভাস্বতী আর দ্বিরুক্তি না করে উঠে পড়লো খাট থেকে।

তোশক আর বালিশ নিয়ে ভাস্বতী চলে এলো পাশের ঘরে।

প্রসেনজিৎ ততক্ষণে জায়গাটা সাফসুফ সরে ফেলেছে। ভাস্বতী বললো, সরুন, আমি বিছানাটা পেতে দিচ্ছি।

হাঁটু গেড়ে বসে ভাস্বতী বিছানার চাদরটা ঠিক করছে, প্রসেনজিৎ খুব আস্তে আস্তে বললো, আমার বিছানায় কোনোদিন আপনার মতন কারুর হাতের ছোঁয়া লাগবে, এটা বিশ্বাসই করতে পারছি না।

ভাস্বতী মুখ না ফিরিয়ে বললো, এবার বিয়ে করলেই পারেন?

–কেউ এখানে আসবে না। আপনিই শুধু এসে পড়েছেন।

তারপর প্রসেনজিৎ তার হাত এগিয়ে এনে ভাস্বতীর চিবুক ছুয়ে বললো, আপনি কি সুন্দর! ভাস্বতী সুখটা সরিয়ে নিল।

প্রসেনজিৎ তবু ভাস্বতীর হাতের ওপর হাত রেখে বললো, এমন সুন্দর আঙুল–এরকম ছবির মতন হাত।

যেন প্রসেনজিতের সঙ্গে তার অনেকদিনের চেনা, এইভাবে ভাস্বতী চোখ দিয়ে মিনতি করে বললো, ছিঃ ওরকম করে না!

প্রসেনজিৎ তার শক্ত হাতখানা এবার ভাস্বতীর গালে রেখে আবার বললো, কি সুন্দর! কতদিন এমন সুন্দর কিছু দেখি নি।

যে–কোনো মুহূর্তে রঞ্জন এ ঘরে আসতে পারে। ভাস্বতী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো। প্রসেনজিৎ হাঁটুর কাছে ভাস্বতীর পা দুখানি চেপে ধরতেই ভাস্বতী ঝটকা মেরে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে দর্পের সঙ্গে চলে গেল পাশের ঘরে।

।।৭।।

দুটি ঘরেরই বাইরের দিকে দরজা আছে, বন্ধ করা যায়। দুটি ঘরের মাঝখানে কোনো দরজা নেই, দরজার সাইজে খানিকটা কাটা। এটা বন্ধ করার কোনো প্রশ্ন ওঠে না। যে–যার বিছনায় শুয়ে পড়ে দু'ঘর থেকে জোরে জোরে গল্প করতে লাগলো।

প্রসেনজিৎ হ্যাজাক নিভিয়ে দিয়েছে। রঞ্জনের মাথার কাছে টর্চ। প্রসেনজিৎও তার যেন রেন–কোটের পকেট থেকে টর্চ নিয়ে গেছে।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, আপনি লাস্ট কবে কলকাতায় গিয়েছিলেন?

–সতেরো বছর বয়েসে। তখন একবার বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম।

কলকাতা আমার ভালো লাগে নি।

–সেটা বুঝতেই পারছি। আপনি কলকাতার কথা একবারও জিজ্ঞেস করেননি। প্রবাসী বাঙ্গালীরা সবাই জিজ্ঞেস করে।

–আমি ঠিক বাঙালীও তো নই।

–ইউ আর ইউনিক্। এখন মনে হচ্ছে, আপনি বেশ ভালোই আছেন। আমাদের ও আজকাল কলকাতা ভালো লাগে না। যাচ্ছেতাই অবস্থা হয়ে গেছে। তাই তো সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়ি।

–বেড়াতে তো সবারই ভালো লাগে।

–শুধু বেড়াবার জন্য নয়। কলকাতা একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে থাকার পক্ষে। আমি দিল্লিতে ট্র্যান্সফার নেবার চেষ্টা করছি।

–দিল্লি বুঝি কলকাতার থেকে ভালো জায়গা?

–এখন অনেক ভালো। অনেক বেশি ফেসিলিটি। আপনি দিল্লি যান কি কখনো?

–না।

–আপনি কোথায় পড়াশুনা করেছেন?

- বেশি পড়াশুনা করার সুযোগ পাইনি।

রঞ্জন একটু থেমে গেল। খুব বেশি ব্যক্তিগত প্রশ্ন কোনো সদ্য পরিচিত ব্যক্তিকে করা যায় না। কিন্তু রঞ্জন যে কৌতূহলী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রঞ্জন আর ভাস্বতীর খাট দুটো ঘরের দু'পাশে। অনায়াসেই একটা খাট টেনে এনে পাশাপাশি শোওয়া যেত, এ চিন্তা রঞ্জনের মাথায় একবার এসেও ছিল–কিন্তু পাশের ঘরে একজনকে রেখে স্বামী স্ত্রীর কাছাকাছি শোওয়ার মধ্যে একটু লজ্জার ব্যাপার আছে।

ঘর এত অন্ধকার যে রঞ্জনের খাট থেকে ভাস্বতীকে ভালো দেখা যায় না। সে জিজ্ঞেস করলো, সতী, ঘুমিয়ে পড়লে?

–না।

ভাস্বতী চুপচাপ শুয়ে আছে। তার ঘুম আসা সম্ভব নয়। খাট দু'টি দরজার মতন কাটা জায়গায় দু' পাশে একটু ত্যারছা ভাবে পাতা। একটি খাট থেকে সেই ফাঁকা জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যায়, আর একটা থেকে দেখা যায় না। যেটা থেকে দেখা যায়, ভাস্বতী ইচ্ছে করে সেই খাটটা নিয়েছে। অন্ধকারে চোখ জ্বেলে সে সর্বক্ষণ তাকিয়ে আছে সেই দিকে। সে অপেক্ষা করছে ওদের কথাবার্তা থেমে যাবার।

অধিকাংশ স্বাস্থ্যবান লোকের মতন রঞ্জনের ঘুম বেশ গাঢ়। অল্প অল্প নাক ডাকে। অর্থাৎ সে কখন ঘুমিয়েছে বা ঘুমোয় নি, তা বোঝা যায়।

এক সময় কথা থেমে গেল। রঞ্জন বললো, গুড নাইট। গুড নাইট, সতী।

একটুক্ষণ পরেই শোনা গেল রঞ্জনের নাসিকাধ্বনি। পাশের ঘরেও চুপচাপ। ভাস্বতীর তবু ঘুম আসছে না। সে যে কেন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তা সে নিজেই জানে না। অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা হয়ে আসছে ভাস্বতীর। একসময় দেখলো, সেই দরজার মতন ফাঁকা জায়গাটায় একটা মনুষ্যমূর্তি।

ভাস্বতী প্রথমে ভাবলো চোখের ভুল। চোখ কচলে দেখলো সত্যিই কিছু নেই। শোনা যাচ্ছে, সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দ।

ভাস্বতী কি এই রকম একটা কিছু দেখার জন্য প্রতীক্ষা করে ছিল এতক্ষণ? প্রতীক্ষা কিংবা আশঙ্কা।

একবার তাকালো রঞ্জনের খাটের দিকে। তারপর ফাঁকা জায়গাটায়। কিছু নেই।

অন্ধকারের মধ্যে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে, মনে হয় যেন অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে। এরকম ভাবেই মানুষ ভূত দেখে। সত্যিই চোখের ভুল। আবার তাকিয়ে দেখলো প্রসেনজিৎ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এক–পা যেন ঘরের মধ্যে ঢুকেএলো। ভাস্বতী নিশ্বাস বন্ধ করে রয়েছে। দু' এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আবার সরে গেল। তখন ভাস্বতীর আবার মনে হলো চোখের ভুল।

রঞ্জনের নাকের আওয়াজ নিয়মিত তাল নিয়েছে। ভাস্বতী যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে খাট থেকে নামলো। এইরকম খাট থেকে নামবার সময় একটু মচ্‌মচ শব্দ হয়ই। পা টিপে চলে এলো রঞ্জনের কাছে। তার কপালে হাত রাখলো। ঘুমন্ত পুরুষের মুখ শিশুর মতন দেখায়। পুরুষরা এ কথা জানে না। ঘরের অন্ধকার এখন নিশ্ছিদ্র নয়–বোধহয় আকাশের মেঘ সরে গেছে। ভাস্বতী আর একটা

হাত রাখলো রঞ্জনের গালে। জাগিয়ে না দিলে রঞ্জন সারারাতই এইভাবে ঘুমোবে। প্রয়োজনে সে রাতের পর রাত জেগে থাকতে পারে– আবার ঘুমিয়ে পড়লে নিশ্চিন্তে ঘুমোবে। রঞ্জনের তো চিন্তার কোনো কারণ নেই।

ভাস্বতী আস্তে আস্তে ঠেলা দিয়ে রঞ্জনকে জাগিয়ে দিল। ধড়মড় করে উঠে বসে ব্যস্তভাবে রঞ্জন বললো, কে? কি হয়েছে?

ভাস্বতী ফিসফিস করে বললো, আস্তে! এই শোন, একটু উঠবে?

–কেন?

–একটু বাইরে যাবো।

–কেন?

–আমি একটু বাইরে যাবো।

কাঁচা ঘুম ভেঙে এই কথা শোনা পছন্দ হয় না রঞ্জনের। বিরক্তি লুকোতে না পেরে সে বলে, এখন যেতে হবে? আগে যেতে পারলে না?

–বাঃ, ওর সামনে কি করে যাই?

–ও যখন জল আনতে গিয়েছিল?

–তুমি রাগ করছো। একটু চলো,.লক্ষীটি। আমি কি একলা একলা যাবো?

রঞ্জন জানে, উঠতে তাকে হবেই। সুতরাং ঘুমের জড়তা কাটিয়ে বিরক্তিটাকেও মুছে ফেলার চেষ্টা করলো।

দরজা খুলে টর্চ জ্বেলে সাবধানে বাইরেটা দেখে নিল আগে। রঞ্জনের আর এক হাতে রিভলবার। পাশের ঘরে কোনো সাড়া –শব্দ নেই। ভাস্বতী বেরিয়ে এসেছে।

একটু নেমে রাস্তার ওপাশে ঢালু জায়গায় একটা আড়াল মতন জায়গা পছন্দ হলো। টর্চের আলোয় তার চারপাশটা খুব ভালো রকম দেখে নেওয়া হলো কোনোরকম ব্যাঙ, মাকড়সা বা কেঁচো আছে কিনা।

গর্ত–টর্ত নেই। সুতরাং সাপের কথা মনেই আসে না।

রঞ্জন চলে এলো দরজার কাছে টর্চটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলতে লাগলো অন্যদিকে। হঠাৎ হঠাৎ ঝুপসি গাছের মাথায় আলো ফেললে বুকটা কিরকম ছমছম করে– মনে হয় কেউ যেন ওখানে ছিল, এইমাত্র সরে গেল।

মেঘ কেটে গেছে অনেকটা, ঈষৎ জ্যোৎস্নায় ছাই রঙের আলো। অরণ্য একেবারে নিঃশব্দ নয়, কাছে দূরে নানারকম অস্পষ্ট শব্দ।

হঠাৎ দরজা খুলে প্রসেনজিৎ বেরিয়ে এলো। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলো, এখানে কি করছেন?

রঞ্জন খুবই ইতস্ত করে বললো, মানে ও একটু বাথরুম.....

–কোথায়?

–ঐদিকে।

–শিগগির চলে আসতে বলুন।

নিজেই সে গলা চড়িয়ে বললো, এই যে, শুনছেন, এক্ষুনি চলে আসুন!

একজন মহিলাকে যে এই অবস্থায় এরকমভাবে কথা বলা যায় না, প্রসেনজিতের সে ভ্রুক্ষেপ নেই। তার গলা থেকে বিনীত ভাবটা ঝরে গেছে। এখন সে সভ্যতা ভদ্রতার নিয়মের তোয়াক্কা করে না।

রঞ্জনের দিকে ফিরে বিরক্ত ভাবে বললো, এরকমভাবে আসা মোটেই উচিত হয় নি। আমাকে ডাকতে পারতেন। আমি নিজেও কক্ষনো একলা রাত্তিরে বাইরে বেরুই না। জঙ্গলে এত রাত্তিরে ছেলেখেলা চলে না। রঞ্জন বিস্মিত ভাবে বললো, কেন, কি হয়েছে?

-কত কি হতে পারে। রাত্তিরবেলা এমন কোনো প্রাণী বেরুতে পারে, যার খোঁজ আমরাও রাখি না-কখনো চোখেও দেখি নি। শুধু রাত্তিরবেলা বেরোয় এমন জানোয়ার ঢের আছে।

-জায়গাটা আমি ভালো করে দেখে নিয়েছি।

-তাতে কিছু যায় আসে না। একটা আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন?

মাটিতে ভারী জিনিস ঘষটানোর একটা আওয়াজ সত্যিই পাওয়া যাচ্ছে।

একটু দূরে।

রঞ্জন বললো, কিসের আওয়াজ?

-আমিও বুঝতে পারছি না। বললাম না, অন্ধকারে এমন প্রাণীও বেরুতে পারে যার খোঁজ আমি বা আপনি কেউই রাখি না।

-নীল গাই হতে পারে। এদিকে কি হাতিটাতি আছে?

-না। নীল গাই দু' একটা দেখা যায়।

ভাস্বতী চলে এলো এই সময়। ওদের কারুর দিকে না তাকিয়ে, একটাও কথা না বলে চলে গেল ঘরের মধ্যে। প্রসেনজিৎ ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলো ভাস্বতীর চলে যাবার দিকে। তারপর রঞ্জন বললো, রাত্রে কিছু দরকার -টরকার হলে আমাকে ডাকবেন।

রঞ্জন একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেছে। ছেলেটি তার চেয়ে বয়েসে ছোট হয়েও মাঝে মাঝে এমন ভারিক্কি সুরে কথা বলে যে চমকে যেতে হয়। সে তার অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ধমকেই দিল রঞ্জনকে। রঞ্জন বললো, আপনি এতদিন জঙ্গলে থেকেও জঙ্গলকে এত ভয় পান?

-রাত্তির বেলার জঙ্গলকে কক্ষনো বিশ্বাস করতে নেই। রাত্তিরবেলা জন্তু-জানোয়ারদের আসল রূপ জেগে ওঠে।

-আজকাল আর হিংস্র জন্তু-জানোয়ার বিশেষ নেই কোথাও।

-আমি সে সম্পর্কে নিশ্চিত নই।

-অবশ্য সাপের কথা আলাদা।

প্রসেনজিৎ এবার হেসে বললো, একমাত্র সাপ সম্পর্কেই আমার কোনো ভয় নেই। সেইজন্য আমি বোধহয় সাপের কামড়েই মারা যাবো।

ঘড়ি দেখে বললো, মাত্র পৌনে এগারোটা। বিশ্বাসই করা যায় না, আমি তো এক ঘুম দিয়ে উঠলাম। একটু দেখবেন নাকি, জানোয়ারটা এদিকে আসে কিনা।

-নাঃ, তার দরকার নেই। চলুন শুয়ে পড়ি।

-আসুন, একটা সিগারেট খাওয়া যাক্।

দু'জনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে দুই বন্ধুর মতন পাশাপাশি বসলো দরজার সামনে। সেই আওয়াজটা তখনো আছে, তবে যেন সরে যাচ্ছে আরও দূরে। খুব কাছেই একটা ঝোপের মধ্যে খরখর করে উঠতেই রঞ্জন পিস্তল বাগিয়ে ধরলো, প্রসেনজিৎ তার কব্জি চেপে বললো, ও কিছু নয়, খরগোশ। এখানে বসে থাকলে এরকম কত আওয়াজ শুনবেন।

রঞ্জন বললো, একবার সুন্দরবনে শিকার করতে গিয়েছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে। চামটা ব্লকের নাম শুনেছেন? সেখানে-

প্রসেনজিৎ হাই তুললো। গল্প শোনার আগ্রহ তার নেই। একটু বাদেই দু'জনে উঠে গেল শুতে।

রঞ্জন ঘরে ঢুকে দেখলো ভাস্বতী চোখ বুজে শুয়ে আছে। ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা বোঝা যায় না। নিশ্বাসে বুক উঠছে নামছে। রঞ্জন কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে আলতো ভাবে ডাকলো, সতী–

ভাস্বতী তৎক্ষণাৎ দু' হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো রঞ্জনের কোমর। বললো, তুমি একটু কাছে থাকো–

–কেন, তোমার ভয় করছে?

–না। তোমাকে একটু ছুঁয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে।

এই ক্যাম্প খাটগুলো এমনভাবে তৈরী যে দু'জনে শোবার সুবিধে নেই। রঞ্জন ভাস্বতীর বুকে হাত রেখে নিঃশব্দে ওষ্ঠ চুম্বন করলো। পাশের ঘরের ছোকরাটি কিছু শুনতে না পায়, সেটাও মনে আছে। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রঞ্জন ফিরে যায় নিজের খাটে।

একটু জোরে জিজ্ঞেস করলো, প্রসেনজিৎবাবু, ঘুমোলেন?

কোনো সাড়া না পেয়ে রঞ্জন ভাবলো, পাহাড় ভেঙে ওরকম একটা বড় জলের বালতি দু'বার তুলতে হলে তারপর অজ্ঞান হয়ে ঘুমানো ছাড়া উপায় কি? টর্চ জ্বেলে রঞ্জন আর একবার দেখে নিল, দরজা বন্ধ আছে কিনা, তারপর চোখ বুজলো।

কত মিনিট বা কত ঘন্টা বা কত যুগ কেটে গেল, ভাস্বতী তা জানে না।

একটু তন্দ্রা এসেছিল, রঞ্জনের নাক ডাকার শব্দ জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তা ছুটে গেল। অমনি ভাস্বতী চেয়ে দেখলো, দু'ঘরের মাঝখানের দরজার মতন অংশটির দিকে। একটি মনুষ্য অবয়বের রেখা সেখানে দাঁড়িয়ে। সত্যি, না চোখের ভুল?

ভাস্বতী কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। অন্ধকারের মধ্যে তাকালে এরকম দৃষ্টিবিভ্রম হয়। ভাস্বতী দু'হাতে চোখ ঢাকলো। আবার খুললো। তখনও ছায়ামূর্তিটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। না, এ হতেই পারে না। ভাস্বতী পাশ ফিরলো–সে আর ওদিকে তাকাবে না।

কিন্তু এ ভাবে কেউ শুয়ে থাকতে পারে? যদি সত্যিই কেউ দাঁড়িয়ে থাকে ওখানে! রঞ্জনকে ডাকতে হবে। এমনি ডাকলে রঞ্জনের ঘুম ভাঙার সম্ভবনা কম।

ভাস্বতী আবার সেদিকে না তাকিয়ে পারলো না। তখনও ছায়াটা সেখানে রয়েছে। এত কি চোখের ভুল হতে পারে? এবার মনে হচ্ছে, সেই ছায়ামূর্তি যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ভাস্বতী অনুচ্চ স্বরে, রঞ্জন শুনতে না পায়, এমনভাবে জিজ্ঞেস করলো,

কে?

কোনো উত্তর নেই।

আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনি ওখানে কি করছেন?

কোন উত্তর নেই।

তখন ভাস্বতীর মনে হলো, হয়তো ওখানে প্রসেনজিৎ নয়। অন্য কোনো অলৌকিক কিছু। প্রসেনজিৎ বলেছিল, এ পাহাড়ে অনেকে মারা গেছে। সেই জন্যই কি সে রাত্তিরে বাইরে বেরুবার জন্য অমন রাগারাগি করছিল? সে কিছু জানে?

ভাস্বতী এই চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলো, অন্ধকারেই এইসব কুসংস্কারের বল বৃদ্ধি হয়। টর্চটা তার কাছে থাকলে সে আলো ফেলে দেখতো।

আবার তাকাতেই ভাস্বতী দেখলো ছায়ামূর্তি তার দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে।

নিঃশব্দে পা মেপে মেপে এগিয়ে আসছে সামনে। এ কখনো মানুষ নয়। অন্য কিছু। দারুণ ভয় পেয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো, কে, কে?

তড়াক করে খাট থেকে নেমে ভাস্বতী রঞ্জনের কাছে ছুটে গেল। রীতি মতন জোড়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে বললো, এই, এই–

রঞ্জনের ঘুম সহজে ভাঙে না। ভাস্বতী আর পেছন দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। রীতিমতন আর্ত গলায় সে চেঁচিয়ে উঠলো, এই, ওঠো! ওঠো!

অমনি দু' ঘরের মাঝখানের জায়গাটা থেকে প্রসেনজিৎ বেশ জোরে ডেকে উঠলো, রঞ্জনবাবু, রঞ্জনবাবু।

এবার রঞ্জনের বিরক্ত হবার পালা। সে উঠে বসে বললো, কি, ব্যাপারটা কি?

প্রসেনজিৎ বললো, আমি একবার ভেতরে আসতে পারি? এ ঘরে এমনি ঢুকবো কিনা ভাবছিলাম। কিন্তু আমার রাইফেলটা বিশেষ দরকার।

-কেন, কি হয়েছে?

-সেই আওয়াজটা দরজার কাছেই শুনতে পাচ্ছি।

-কিসের আওয়াজ?

-কোনো জানোয়ার -টানোয়ার হবে।

-রঞ্জন শৌখিন শিকারী। এই কথায় সে দ্রুত খাট থেকে নেমে পড়ে বলে, চলুন তো দেখি?

প্রসেনজিৎ ভেতরে ঢুকে তার রাইফেলটা নিয়ে নেয়। এবং একবার গূঢ়ভাবে তাকায় ভাস্বতীর দিকে।

ভাস্বতীর মনে হয়, দরজার কাছে তা হলে অলৌকিক কিছু ছিল না। চোখের ভুলও নয়। ছেলেটি রাইফেলটা নেওয়ার জন্য ইতস্তত করছিল। যে-ঘরে স্বামী -স্ত্রী শুয়ে আছে, পৃথক শয্যা হলেও সে ঘরে ঢুকতে তার দ্বিধা। যদিও তার নিজের ঘর। এ ব্যাপারটা মন্দ নয়। কোনো একটি বিষয়ের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা পেলে মন সন্তুষ্ট হয়। লোভী হলেও ছেলেটির সহবত জ্ঞান আছে। অন্যের ভদ্রতাবোধ অক্ষুন্ন আছে দেখলে এখনো সবারই ভালো লাগে।

রঞ্জন আর প্রসেনজিৎ একটু একটু করে দরজা ফাঁক করলে। ভাস্বতী গিয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের কাছে। প্রসেনজিৎ তাকে বললো, ভয়ের কিছু নেই- আপনি শুয়ে পড়ুন।

-না, আমিও দেখবো।

রঞ্জন বললো, কোথায় আওয়াজ?

-একটু আগেই শুনতে পাচ্ছিলাম।

ভাস্বতী অবশ্য কোনো আওয়াজ শোনে নি। তবে এমনও হতে পারে, অরণ্য জগতের শিক্ষিত কানই এসব আওয়াজ শুনতে পায়।

প্রসেনজিৎ বললো, আমার ঘরের ঠিক ডান দিকেই আওয়াজটা হচ্ছিল।

-চলুন, বেরিয়ে দেখা যাক।

-দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান।

-আজ রাত্তিরে ঘুমোতে দেবে না দেখছি। কালকেও ডাকবাংলোতে ভালো ঘুম হয়নি, বড্ড মশা। এ পাহাড়ে কিন্তু মশা নেই।

-আপনারা শুয়ে পড়ুন না। আমি বসছি এখানে। রাইফেলটা দরকার ছিল।

তা কি হয়, আপনি একলা একলা বসে থাকবেন? আওয়াজটা কি রকম? পাইথনটা নয় তো?

-না, পাইথন এ রকম শব্দ করে না।

অচেনা পাহাড়, গভীর রাত, অজ্ঞাত জন্তুর শব্দ, ঘরের মধ্যে দু' জন শস্ত্রধারী পুরুষ ও নারী। কিন্তু কারুর মুখে কোনো ভয়ের ছায়া নেই। ভাস্বতী দাঁড়িয়ে আছে স্বামীর গায়ে ঠেস দিয়ে।

একটু আগে সে সত্যি ভয় পেয়েছিল। আশ্চর্য, সে ভূতে বিশ্বাস করে না- তবু সে মনের জোর রাখতে পারে নি, ভূতের ভয়ই পেয়েছিল। এখন আবার সব কিছু স্বাভাবিক লাগছে।

প্রসেনজিৎ বললো, আমি এতদিন এখানে আছি, কোনোদিন কোনো জন্তু- জানোয়ার রাত্তিরবেলা ঘরের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করে নি। সুতরাং আজকের রাত্তিরেই যে হঠাৎ করে কিছু একটা বিপদ দেখা দেবে এটা হতে পারে না। দরজা বন্ধ করে ঘুমালো ভয়ের কিছু নেই।

-এই আওয়াজটা আগে কখনো শোনেন নি?

-অন্যান্য রাত্তিরে অঘোরে ঘুমিয়ে থাকি-তাই হয়তো শুনতে পাই নি।

-চোর-ডাকাত নেই তো এদিকে? চোর-ডাকাতরা তো কুসংস্কার মানে না। স্বর্গেও দৈত্যরা গিয়ে ডাকাতি করেছে।

-আমাকে এখানকার লোকেরা ভয় পায়। আমি এই পাহাড়ে এতদিন থেকেও প্রাণে বেঁচে আছি।

ভাস্বতী বললো, কোনো আওয়াজ তো শোনা যাচ্ছে না।

রঞ্জন বললো, বাইরে বেরিয়ে দেখা যাক্।

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীকে বললো, আপনি ঘরে থাকুন।

-মোটেই না!

তিনজনেই বেরিয়ে এলো বাইরে। ঘরের চার পাশে আলো ফেলে দেখা হলো। কোথাও কিছু নেই। একটা কি ইঁদুরের মতন প্রাণী সরসর করে ছুটে গেল মাটি দিয়ে।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করেও কিছুই পাওয়া গেল না। রঞ্জন আফসোসের সুরে বললো, আমার শিকারের লাক্ নেই।

দূরবর্তী জমাট অন্ধকারের দিকে রিভলবারটা উঁচিয়ে রঞ্জন ট্রিগার টিপলো। গম্ভীর বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড়ে। অরণ্যে জেগে উঠলো চাঞ্চল্য-কাছেই কোনো গাছে এক পাল বাদুড় ছিল, উড়ে গেল ডানা ঝটপটিয়ে, ঝোপঝাড়ের মধ্যে খচমচানি, একটা নিঃসঙ্গ কাকের ডাকও শোনা গেল।

প্রসেনজিৎ সামান্য হেসে বললো, এক একটা বুলেটের দাম পাঁচ টাকার বেশি। আমি সহজে খরচ করি না।

রঞ্জন বললো, আমি খরচ করার সুযোগে পাই না।

ভাস্বতী বললো, আওয়াজটা কিন্তু শুনতে বেশ ভালো লাগলো। আর একবার করো না?

রঞ্জন বললো, রাইফেলের আওয়াজ আরও ভালো হবে।

কিন্তু প্রসেনজিৎ রাইফেল তুললো না। গুলি খরচ করার ইচ্ছে তার নেই।

রঞ্জন অন্য দিকে ফিরে আর একবার ফায়ার করলো। এবারে বুলেটটা কোনো পাথরে লেগেছে বোঝা যায়। দূরে চড়াৎ করে ছিটকে উঠলো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

প্রসেনজিৎ বললে, শুধু শুধু নষ্ট করছেন!

প্রসেনজিৎ জানে না, মানুষের জীবনে কিছু অপব্যয় করাটাই সুস্থতার লক্ষণ। যার যে-টুকু প্রয়োজন, তারও অতিরিক্ত কিছু না-পেলে বা না-দিলে জীবনে শান্তি নেই।

ভাস্বতী বললো, এই আওয়াজ শুনে আর কোনো জন্তু জানোয়ার কাছে আসবে না। চলো না আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

রঞ্জন অবাক হয়ে বললো, এখন? এখন কোথায় বেড়াতে যাবে?

-বাইরে এসে কিন্তু একটুও ভয় করছে না বেশ হালকা হালকা লাগছে। চলো না, মন্দিরের দিকে ঘুরে আসি!

-তোমার খুব উৎকট শখ দেখছি।

প্রসেনজিৎ বললো, রাত্তিরবেলা মন্দিরের দিকে যাওয়া অসম্ভব।

-কেন?

-একটা খাদের পাশ দিয়ে যেতে হয়।

-টর্চ রয়েছে তো।

–আপনি জায়গাটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। যদি সেখানে নিয়ে যাওয়া এখন সম্ভব হতো, আমি ঠিকই নিয়ে যেতাম।

দায়িত্বশীল স্বামীর মতন বললো, এখন যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

চলো, আমার ঘুম পাচ্ছে।

প্রসেনজিৎ রাইফেলটা রেখে দিল নিজের কাছে। দরজা বন্ধ করে যে –যার শুয়ে পড়লো। ভাস্বতীর এখন অনেকটা স্বস্তি লাগছে। খানিকক্ষণের মধ্যেও মাঝখানের দরজাটার দিকে তাকিয়ে সে আর কোনো ছায়ামূর্তি দেখতে পেলা না। এবার সে ঘুমোবে।

বন্দুক –পিস্তলের শব্দে একটা উত্তেজনা আছে।তাই রঞ্জনেরও ঘুম আসতে দেরি হয়। টুকিটাকি কথা বলে। আস্তে আস্তে তার কথা এলিয়ে যায়। অল্প পরে শোনা যায় তার ঘুমের আওয়াজ।

ভাস্বতী তবু কিছুক্ষণ জেগে থাকে। বার বার চমকে চমকে তাকায় মাঝখানের দরজার দিকে। এখন কিছুই দেখতে পায় না। চোখের ভুলেও কিছু দেখা যায় না। কিন্তু, ভাস্বতী ভাবলো, এইরকম ভাবে বার বার তাকাতে হলে সারা রাত্তিরে তার আর ঘুম আসার সম্ভাবনা নেই। অথচ শরীরে একটু একটু ঘুমের আমেজ এসে দানা বাঁধছে।

ভাস্বতী সেই দরজার দিক থেকে পেছনে ফিরে শুলো। সে আর কিছুই দেখবে না।

তন্দার ঘোরে ছোট ছোট স্বপ্ন।... একটা ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে, সবে হাঁটতে শিখেছে–দুলে দুলে হাঁটছে, ইস কি মিষ্টি––কার ছেলে? এ কাদের ছেলে? তোমরা জানো না কেউ? ভাস্বতী দু'হাত বাড়িয়ে ডাকলো, 'আয়, আয়, আয়–' আরে, এ তো ভাস্বতীর দিদির ছেলে– টাম্পু–ওমা, দ্যাখো, দ্যাখো, এর মধ্যেই হাঁটতে শিখে গেছে– আমরা হামাগুড়ি দিতে দেখে এসেছিলাম। টাম্পু ঝাঁপিয়ে এলো ভাস্বতীর কোলে। ভাস্বতী তাকে চুমোয় চুমোয়....।–যাঃ এ কি দেখছে ভাস্বতী, দিদির ছেলে টাম্পুর তো এখন ন' বছর বয়েস –ভাস্বতীর দিদি বললো, অত বড় ছেলেকে কোলে নিয়েছিস কেন, নামিয়ে দে, বড্ড আদুরে হচ্ছে, মাসীর কাছ থেকে এত আদর পায়–হ্যাঁ রে, সতী, তোদের বিয়ে হয়ে গেল সাত বছর –এখনো–এসব তোদের কি আদিখ্যেতা বুঝি না, ...। না, দিদি, আমরা দু'জনেই ডাক্তার দেখিয়েছি–দু'জনেরই কোনো দোষ নেই, এমনিই–।

অনাথ আশ্রম থেকে একটা ছেলে এনে.....রঞ্জনের বড্ড মেয়ের শখ।

অন্য স্বপ্ন। মায়ের সামনে ভাস্বতী –আমি এ বিয়ে করবো না। কিছুতেই করবো না ....। সতী, শোন–তোর বাবা.....। আমাকে কিছুতেই রাজী করাতে পারবে না –আমি বাড়ি থেকে চলে যাবো।....তা হলে কি রঞ্জনকেই –হ্যাঁ, রঞ্জনকে ছাড়া আর কারুকে আমি কিছুতেই .....ওদের যে পদবী সরকার–তোর বাবাকে তো জানিস–ছেলে তো ভালোই। রঞ্জন, তোমার জন্য আমি, তোমার জন্য আমি....

তৃতীয় স্বপ্ন। তার পাশে কে যেন শুয়ে আছে। কে রে বাবা? মানুষ তো নয়, একটা দারুণ মোটা সাপ। ময়াল সাপ, না পাইথন। যে সাপটা ধরা পড়েনি এখনো সেটাই লুকিয়ে লুকিয়ে তার বিছনায় উঠে এসেছে। ভাস্বতীর গা দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে। কিন্তু নড়তে পারছে না। নড়তে গেলেই যদি কামড়ে দেয় সাপটা! রঞ্জনকে ডাকবে? রঞ্জনকে না প্রসেনজিৎকে? রঞ্জন যদি হঠাৎ উঠে এসে বিপদে পড়ে–তার বদলে প্রসেনজিৎকেই ....ওরছোট মামা বলতেন, আস্তিক মুনির নাম করলেই সাপরা–আস্তিক, আস্তিক, আস্তিক, আস্তিক.....

ভাস্বতীর ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভাস্বতী সে একটা অস্বস্তি বোধ করলো। মেয়েদের পিঠের কাছে যে চোখ থাকে, সেই চোখ দিয়ে ভাস্বতী দেখলো, তার খাটের পাশে একজন কেউ দাঁড়িয়ে আছে। এটা স্বপ্ন নয়।

সে এখন জেগেই আছে। সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরলো, দেখলো অন্ধকারে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে। রঞ্জন, না প্রসেনজিৎ? পুরুষটি তাকে স্পর্শ করা মাত্র সে বুঝলো, রঞ্জন নয়, ওপাশের খাটে ঘুমন্ত রঞ্জনের নিশ্বাসের শব্দ।

পুরুষটি হাত ধরে ভাস্বতীকে টানলো।

সিদ্ধান্ত নিতে কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময় লাগলো ভাস্বতীর। মৃত্যুর আগেও মানুষ এত দ্রুত চিন্তা করে না।

ভাস্বতী যদি চেঁচিয়ে ওঠে, তা হলে ঘুম ভেঙে রঞ্জন অন্ধকারে তার স্ত্রীর পাশে দাঁড়ানো অপর পুরুষকে দেখে কি করবে? রঞ্জনের শিয়রের কাছে রাখা আছে অস্ত্র, সে হঠাৎ গুলি ছুড়তেও পারে। কিংবা তা যদি নাও হয়, এই পুরুষ দু'জন কি পরস্পরকে আর কোনোক্রমে সহ্য করতে পারবে?

বাকি রাতটা কাটবে কি ভাবে? এরা যদি অন্য রকম ভাবেও লড়াই শুরু করে, দূরে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে ভাস্বতী?

যদি একজন আর একজনকে মেরে ফেলে? যদি প্রসেনজিৎ মেরে ফেলে রঞ্জনকে? না, না, না–

ভাস্বতীর ভীষণ দুঃখ হলো, সেই মুহূর্তে সে এ কথাও ভাবলো, কেন মেয়ে হয়ে জন্মালাম! তার চোখের কোণে টলটলিয়ে এলো দু' ফোঁটা জল।

নিঃশব্দে খাট থেকে নেমে এলো ভাস্বতী। প্রসেনজিৎ তার হাত শক্ত করে চেপে ধরে আছে, অন্য হাতে রাইফেল। এইজন্যই তখন সে রাইফেলটা নিয়েছিল। বাইরে আওয়াজ টাওয়াজ হওয়ার কথা মিথ্যে। রঞ্জন যদি হঠাৎ জেগে ওঠে–সেইজন্য সে সশস্ত্র থাকতে চায়। সে এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ভাস্বতী ঘুমন্ত রঞ্জনের দিকে এক পলক তাকিয়ে খাটের থেকে নেমে এলো। প্রসেনজিৎকে কোনো বাধা দিল না, একটাও কথা বললো না, পূর্ব নির্দিষ্ট অভিসারের মতন চলে এলো পাশের ঘরে। সেখান থেকে বাইরে। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, চাপা জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে বনে বনান্তরে। হাওয়া উঠছে এখন। এই রকম জ্যোৎস্না রাতেই কি সবাই বনে যেতে চায়?

রাইফেলটা পাথরে ঠেস দিয়ে রেখে প্রসেনজিৎ ভাস্বতীর দু' হাত ধরে মুখোমুখি দাঁড়ালো। তার চোখ দুটি যেন হীরের মতন জ্বলছে।

ভাস্বতী খুব শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি চান?

অনেকখানি উত্তেজনাজনিত ভাঙা গলায় প্রসেনজিৎ বললো, আমি আপনাকে চাই।

–কেন?

––আমি কখনো সুন্দর কিছু পাই নি।

–এই রকম ভাবে কি পাওয়া যায়?

–কী রকম ভাবে পেতে হয় আমি জানি না। আমাকে তো কেউ কিছু নিজে থেকে দেবে না? আমাকেই পেতে হবে চেষ্টা করে। জোর করে কেড়ে নেবো?

–আমি কি এক টুকরো মাংস?

–না, আপনি একটা সুন্দর সৃষ্টি।

–এখন বুঝতে পারছি, আমি সুন্দর–টুন্দর কিছুই নই। আমি শুধুই রক্ত–মাংস।

–ওসব আমি বুঝি না। আমি আপনাকে চাই। দরকার হলে আমি আপনার স্বামীকে এক্ষুনি খুন করতে পারি। রাইফেলের একটা শট। কিংবা বড় সাপের খাঁচাটা খুলে ছেড়ে দিতে পারি ওর গায়ে।

–এই ভাবে কোনো মেয়েকে পাওয়া যায়?

–কী ভাবে–টাবে আমি জানি না। আমি কি জীবনে কিছুই পাবো না?

–গোড়া থেকেই আপনার এই উদ্দেশ্য ছিল?

–তা যদি থাকতো, তা হলে অনেকক্ষণ আগেই আমি ওকে শেষ করে ফেলতে পারতাম।

–আমি জানি, আপনি ওরকম কিছু করবেন না।

–কেন!

–কারণ, আপনাকে মানায় না। জন্তু–জানোয়াররা এরকম ভাবে মারামারি করে।

–আপনাকে আমি বলিনি, আমার ডাকনাম পশু?

–তা হোক, আপনার ভালো নাম মানুষ। মানুষ এ রকম করে না।

–করে না? আপনি মানুষকে কিছুই চেনেন না। সারা পৃথিবীতে এসব কি হচ্ছে তাহলে? মানুষের চেয়ে হিংস্র আর কেউ আছে?

–তা হোক। তবু মানুষই ভালো হবার চেষ্টা করে।

–এর মধ্যে ভাল–মন্দ কি দেখছেন? এই পৃথিবীতে যারা শুধু বঞ্চিত হয়ে থাকে, আমি তাদের একজন। কিন্তু আর বঞ্চিত হয়ে থাকবো না। আমি চাই, আমি চাই, আমি চাই---

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীর কোমর ও পিঠ বেষ্টন করে তাকে হ্যাঁচকা টানে কাছে টেনে আনলো। শরীরে শীরর মিশিয়ে ঠোঁট চেপে ধরলো।

ভাস্বতী কোনো রকম বাধা দিল না। শরীর আড়ষ্ট করলো না, চুম্বন থেকে মুছে নিল না উত্তাপ। একটি হাত রাখলো প্রসেনজিতের পিঠে।

প্রসেনজিতের গায়ে ঠিক যেন নদীর জলের গন্ধ।

ভাস্বতী চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ছে, কিছুতেই কান্না থামাতে পারছে না সে, শব্দ করছে না যদিও। আঁচল নেই চোখে চাপা দেবে। প্রসেনজিতের গালে লাগলো সেই অশ্রুর ফোঁটা।

প্রসেনজিৎ উত্তেজনায় কাঁপছে। নিজের গালে হাত দিয়ে সে বললো, এ কি, রক্ত?

ভাস্বতী নিজের হাত দিয়ে প্রসেনজিতের গাল থেকে পরম স্নেহের সঙ্গে মুছে দিল সেই জল। অত্যন্ত নরম গলায় বললো, ছিঃ, এরকম করে না। এরকম আর করবেন না বলুন!

–কেন, কী হয়েছে, এতে কি পাপ হয়? আপনার স্বামী কিছু জানতে পারবে না।

–আমি পাপ–পুণ্য মানি না। কিন্তু আমার মনে খুব কষ্ট হবে।

প্রসেনজিতের তপ্ত হাত তখনও ভাস্বতীর কোমরে। সে বললো, আমি আর পারছি না। আমি আপনাকে চাই। কি হয় এতে?

–শরীরের কিছু যায় আসে না। কিন্তু আপনি আমার মনে কষ্ট দিতে চান?

–আপনি কাঁদছেন?

–লক্ষীটি এরকম আর করবেন না।

–আপনি আমার সঙ্গে এরকম ভাবে কথা বলছেন কেন? আমি জোর করলে আপনি কী করতে পারবেন?

–আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে চাই।

–কান্না –টান্না আমার সহ্য হয় না।

–আমরা এখানে এসে ভুল করেছি। আপনি কি সেই ভুলের সুযোগ নিতে চান?

–নিশ্চয়ই!

––ছিঃ! এরকম আপনাকে মানায় না।

–আপনি যদি ভুল করে গরীবের ঘরে জন্মাতেন, তা হলে দেখতেন, সমস্ত সমাজ আপনার ওপর সুযোগ নিচ্ছে।

–ও কথা আলাদা। আমি কি কোনো দোষ করেছি?

–আপনাকে পাওয়া মানেই সবকিছু পাওয়া।

–জোর করলে মেয়েদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। শুধু একটা নির্জীব শরীর।

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীর কোমর থেকে হাত সরিয়ে নিল। ভাস্বতী তার সেই হাতটা নিজের মুঠোয় নিয়ে বললো, এ রকম আর করবেন না, কথা দিন।

–আমি কোনো কথা দিতে পারি না।

–এ ঘরে আজ রাত্তিরে আর আসবেন না।

–আমি জানি না। বলতে পারেন, আমি কেন এই পাহাড়ে একা একা সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে থাকবো–আর আপনারা শহরে থেকে সব পাবেন?

–আমিও তা জানি না। কিন্তু রাত্তিরবেলা একজন নারী ও পুরুষের মধ্যে এ সব প্রশ্ন উঠে না।

ভাস্বতী মোহময় ভঙ্গিতে প্রসেনজিতের হাতে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো, আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে চাই। আমি যাই? আপনি শুয়ে পড়ুন।

–আমার কিছুতেই ঘুম আসছে না। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলছে।

–আমি একটু মাথা টিপে দেবো?

প্রসেনজিৎ এমন ভাবে ভাস্বতীর দিকে তাকালো যেন এক্ষুনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ভাস্বতী হাত তুলে বললো, না!

–ঠিক আছে।

–আমি যাই?

–প্রসেনজিৎ তাকে বাধা দিল না। শুকনো গলায় বললো, ডান দিক ঘেঁষে যাবেন। সাবধান সাপের খাঁচার পাশে পা দেবেন না–

–আপনি আমাকে এগিয়ে দিন।

ভাস্বতী হাত বাড়িয়ে দিল। ও ঘরের মধ্যে পা দিয়ে ছেড়ে দিল হাত।

প্রসেনজিৎ গুম হয়ে বসে রইলো বিছানায়। তার মাথার মধ্যে বহুরকম চিন্তার ঘূর্ণিপাক চলছে।

কিন্তু একটা কথা সে সারাজীবনেও জানতে পারবে না–সেই মুহূর্তে তার সঙ্গে ব্যাভিচার করার জন্য ভাস্বতী শারীরিকভাবে সম্মত ছিল।

এমনকি মনের মধ্যে একটা আকুলতাও ছিল তার–সারা সন্ধে থেকে সে কি এরই প্রতীক্ষা করছিল না? তবু মেয়েরা কোনো বিচিত্র কারণে এই সময়েও প্রত্যাখ্যান করে চলে যায়। সেই প্রত্যাখ্যানও আন্তরিক। কেননা, মন তো এরকম নয়–একই সঙ্গে মনের মধ্যে অনেক রকম বিপরীত স্রোত। মানুষ সব সময় যা চায়–সেটাকেই আবার ইচ্ছে করে দূরে সরিয়ে দেবার নেশা সারা পৃথিবীর সভ্যসমাজে জনপ্রিয়।

রঞ্জন তখন স্বপ্ন দেখছে।....বৃষ্টি, বৃষ্টি, কি দারুণ বৃষ্টি! সে আর বরুণ দৌড়াচ্ছে, একটা পাহাড়ী রাস্তায় –কোথাও আশ্রয় নেই.....। জায়গাটা কোথায় ....হাফলং নাকি! কিন্তু রাস্তঘাট অন্যরকম মনে হচ্ছে....বৃষ্টিতে যেন আশপাশ ভেঙে পড়ছে ....লাল রঙের ছাতা মাথায় একটি মেয়ে...ঐ যে আমাদের বাড়ি, আসুন –রঞ্জন চলে গেল ছাতার নিচে––বরুণকে সুযোগ দেয়নি.....প্রবল হাওয়ায় উড়ে গেল ছাতাটা –কি হাসি....দৌড়, দৌড়... বারান্দায় একজন সহৃদয় বৃদ্ধ....আঃ, কি আরাম, ফায়ার প্লেসে আগুন, তোয়ালে...রাতটা এখানেই থেকে গেল...। বরুণকে কি যেন একটা মিথ্যে কথা বলেছিল রঞ্জন –বরুণ, তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, সেই থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে–একটা শুধু মিথ্যে কথা–একটি মেয়ের জন্য–কি যেন মিথ্যে কথাটা? বরুণ,

আমি ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা চাইছি-আর আমি জীবনে কখনো মিথ্যে কথা বলবো না-আমি এই সব নীচতা ক্ষুদ্রতার ওপরে উঠে যাবো, ক্ষমা চাইছি, সতীও জানে না--

রঞ্জনের ঘুমন্ত মুখে একটা কাতর রেখা।

।।৮ ।।

ভাস্বতী চোখ মেলে দেখলো, ঘর আলোয় ভরে গেছে। বাইরে কিছু পাখির ডাকাডাকিও শোনা যায়। রঞ্জন তখনও ঘুমিয়ে আছে। শিয়রের কাছে চা দিয়ে না ডাকলে সে আবার কবে ওঠে?

খাট থেকে নেমে পা টিপে টিপে এসে সে সন্তর্পণে পাশের ঘরে উঁকি মারলো।

-প্রসেনজিৎ এরই মধ্যে স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল চাপিয়ে এক পাশে বসে একটা গাছের ডাল নিয়ে দাঁতন করছে। ভাস্বতী সেদিকে যাবে কি যাবে না, ইতস্তত করছিল। প্রসেনজিৎ দাঁতনটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ভাস্বতীকে ডেকে বললো, আসুন।

-ভাস্বতী কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চোখে তখনও ঘুমের দাগ।

-রঞ্জনবাবু ওঠেন নি এখনো?

-না।

-চা হয়ে গেলে ডাকবেন। বসুন না! ঘুম হয়েছে?

ভাস্বতী ঘাড় নেড়ে বললো, হ্যাঁ।

-আমি ভেবেছিলাম, আপনাদের বোধ হয় বেশি বেলাতে ঘুম থেকে ওঠা অভ্যেস, তাই ডাকি নি।

-আমি সাধারণতঃ দেরি করেই উঠি। আজ হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল।

-বসুন না!

-ভাস্বতী বসে পড়লো তার পাশে। এখন আর প্রসেনজিৎ এর হাত ছটফট করে না। সকালের আলোয় সব কিছুই অন্যরকম। এক রাত্তিরেই প্রসেনজিৎ যেন বদলে গেছে।

কাজের মানুষের মতন গলায় বললো, আপনাদের সঙ্গে কি টুথপেষ্ট- ব্রাশ আছে? আমার কাছে ওসব কিছুই নেই। আপনাদের যদি না থাকে-

-ঐ যে সামনে ঝোপটা দেখছেন, ওর থেকে একটা ডাল ভেঙে নিন।

আচ্ছা, আমি এনে দিচ্ছি।

-শাড়ীটা শুকিয়ে গেছে, পরে নিই।

-আগে বাথরুম-টাথরুম সেরে আসুন না। রাস্তাটা ধরে একটু ওপরে উঠে গেলেই--

সকালবেলা পুরুষের পাৎলুন ও গেঞ্জি-পরা ভাস্বতীর চেহারা ভারি মজার দেখাচ্ছে। গেঞ্জির নিচে আবার কালো রঙের ব্রা। প্রসেনজিৎ কিন্তু এখন তার শরীরের দিকে লোভী দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে না। সকালবেলা ওসব মানায় না।

ভাস্বতী শাড়ী -শায়া -ব্লাউজ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। একটুখানি ওপরে উঠতেই চূড়ার মন্দিরটা চোখে পড়লো তার। মন্দিরের ওপরে ত্রিশূলের মতন একটা কিছু আছে-রোদ্দুরে চকচক করছে। পেছন দিকে আরও পাহাড়ের শ্রেণী দেখা যায়।

এরকমভাবে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে ভাস্বতী কখনো পোশাক পরিবর্তন করে নি। স্নিগ্ধ হাওয়া প্রিয় স্পর্শের মতন লাগছে শরীরে। ভাস্বতী কয়েক দন্ড সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কেউ তো দেখার নেই।

নিজেকে মনে হচ্ছে তার বনবালার মতন, স্বপ্নে ছাড়া, এরকম কখনো সম্ভব হবে সে ভেবেছিল? নাচের ভঙ্গিতে সে হাত দুটো মেলে দেয় আকাশের দিকে।

হঠাৎ চোখে পড়লো একটা কাঠবিড়ালী তার দিকে চোখ পিট পিট করে দেখছে, কাছ থেকে। ভাস্বতীরসেটার দিকে তাকিয়ে বললো, এই, তুই কেমন আছিস রে?

কাঠবিড়ালীটা ফুরুৎ ফুরুৎ করে দৌড়া দৌড়ি করছে- কিন্তু চোখ চেয়ে ভাস্বতী দিকে।

ভাস্বতী বললো, এই জানিস, আমি খুব ভালো আছি! আমার এখন ভীষণ, ভীষণ ভালো লাগছে!

রঞ্জন ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙলো, অভ্যেসবশত বৈঠক দিতে যাচ্ছিল। দু'তিন বার করেই থেমে গেল। বাইরে বেরিয়ে এসে বললো, আঃ চমৎকার লাগছে। কালকের রাতটা আমার জীবনে একটা মেমোরেবল্ নাইট। কক্ষনো ভুলবো না। সতী কোথায় গেল?

-উনি ঐ দিকে গেছেন।

গরম গরম চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হয়, বেঁচে থাকাটা বড় আনন্দের ব্যাপার। কত রকম উপভোগের ব্যাপার যে আছে এই পৃথিবীতে। শাড়ী-পরা ভাস্বতীকে রঞ্জন যেন নতুন চোখে দেখে।

প্রসেনজিতের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার দৌলতে বেশ চমৎকার সময় কাটলো। আজকের আবহাওয়া চমৎকার। মেঘ নেই, বেশ ঠান্ডা-ঠান্ডা।

-তুমি প্যান্ট জামা পরে নাও!

রঞ্জনের চকলেট রঙের প্যান্টটা ঠিকই আছে, কিন্তু তার সাদা সার্ট বৃষ্টির জলে ভিজে কেমন ময়লা। এরকম ময়লা জামা সে কখনো পরে নি-

আজ কোনো রকম মন্তব্য না করে, পরে ফেললো। প্রসেনজিতের পাজামা ও গেঞ্জি হাতে করে নিয়ে এসে বললো সতী, ওর এ গুলো আমাদের কেচে দিয়ে যাওয়া উচিত।

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীর কাছ থেকে সেগুলো কেড়ে নিয়ে বললো, রাখুন তো। কিচ্ছু করতে হবে না।

রঞ্জন বললো, বাঃ, বেশ! আপনার জামা-কাপড় পরলাম, আপনার বিছানায় শুলাম, আপনার খাবার-দাবার ধ্বংস করলাম। কি করে যে আপনাকে প্রতিদান দেবো-

-আপনাদের অনেক কষ্ট আর অসুবিধে হলো।

কষ্ট? অসুবিধে? এরকম কষ্ট পাবার জন্য আমি বহু টাকা খরচ করতে রাজী আছি। এরকম অভিজ্ঞতা ক'জনের ভাগ্যে হয়! ফিরে গিয়ে লোকজনের কাছে গল্প করলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। আপনি যদি কখনো কলকাতায় আসেন- আমাদের ঠিকানা দিয়ে যাবো-

ভাস্বতী বললো ঐ দ্যাখো, ঐ দ্যাখো, একটা খরগোশ-

প্রসেনজিৎ রাইফেলটার দিকে হাত বাড়িয়ে বললো, মারবো? বেশ ঝোল রেঁধে খাওয়া যাবে।

ভাস্বতী হাত তুলে বাধা দিল বললো, না, না, মারবেনা না: কি সুন্দর দেখাচ্ছে। একটুও ভয় পায় নি। ছাই-ছাই-রং আমরা যে খরগোশ দেখি সেগুলো সব সাদা।-

-খরগোশটা কান ও গোঁফ নাচাতে নাচাতে ওদের খানিকক্ষণ দেখলো, তারপর সুরুৎ করে পালিয়ে গেল।

রঞ্জন বললো, তুমি এমনভাবে 'দ্যাখো, দ্যাখ্যো' বললে, আমি ভাবলাম বুঝি সোনার হরিণ দেখাচ্ছো।

ভাস্বতী হেসে বললো, এখন কিন্তু আমার আবার মনে হচ্ছে, এই সব জায়গায় একটা ঘর তৈরী করে থাকলে বেশ হয়।

-দিনের বেলা কিনা। আজ রাত্তিরটাও থেকে দেখবে নাকি?

-থাকতে পারি।

-সত্যি তোমার থাকতে ইচ্ছে করছে?

-তুমি যা বলবে!

–তা হলে প্রসেনজিৎবাবুর ওপর বড় বেশি ট্যাক্স করা হয়ে যাবে।

প্রসেনজিৎ কিছু বললো না–নিমন্ত্রণও জানালো না,চুপ করে রইলো। সে জানে, এসব হালকা কথা।

হঠাৎ মনে পড়ার মতন রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, কাল রাত্তিরে তো আর বৃষ্টি হয় নি। নদীর জল কমেছে?

–কমতে পারে। চলুন দেখা যাক্।

–হ্যাঁ, চলুন, সেইটা আগে দেখা দরকার।

তিনজনে নামতে লাগলো পাহাড়ী রাস্তা ধরে। কাল অপরাহ্নে যেখানে দাঁড়িয়ে ওরা দুজনে বৃষ্টিতে ভিজেছিল–তারই কাছাকাছি একটা চাতালের মতন জায়গায় দাঁড়িয়ে নদীটা দেখা যায়।

প্রসেনজিৎ উঁকি মেরে দেখে বললো, জল অনেক কমে গেছে।

ভাস্বতী বললো, আমি তো বুঝতে পারছি না। আমার তো মনে হচ্ছে একই রকম আছে।

–আমি রোজ দেখি তো। আমি বুঝতে পারি।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, এখন আপনার ঐ বৈতরণী পার হওয়া যাবে?

প্রসেনজিৎ বললো, যাওয়ার সময় পিছন দিকে একবারও তাকাবেন না। তা হলে ঠিক পার হয়ে যাবেন।।

ভাস্বতী চকিতে একবার প্রসেনজিতের দিকে তাকিয়ে ফের নদীর দিকে চেয়ে বললো, আমি পার হতে পারবো?

–কেন, আপনার এখনো ভয় হচ্ছে?

–সবাই কি বৈতরণী পার হতে পারে?

প্রসেনজিৎ বললো, কাল যখন এসেছিলেন তার চেয়ে একটু বেশি জল আছে। আপনার কোমর পর্যন্ত হবে। জামাকাপড় আবার ভিজবে। তবে স্রোত এখন অনেক কম হবে।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, জল আরও কমবে?

–অনেক কমে যাবে এক এক সময় খুব কম জল থাকে।

–কিন্তু আবার বৃষ্টি হতে পারে। এখানকার বৃষ্টিকে তো বিশ্বাস নেই।

কখন যে ঝমঝমিয়ে আসবে।

–তা ঠিক।

–সতী, চলো, তা হলে এখন যাওয়াই যাক। আর রিস্ক নেওয়া ঠিক নয়।

ভাস্বতী বললো, নিচে গিয়ে নদীটাকে কাছ থেকে দেখে এলে হয় না!

প্রসেনজিৎ বললো, আপনি বুঝি এখনো বিশ্বাস করতে পারছেন না ঠিক? এখন একবার নিচে নামবেন, ওপরে উঠবেন, আবার তার চেয়ে যদি যেতেই চান, জিনিসপত্তর সঙ্গে নিয়ে একেবারেই চলুন। আমি তো বলছি, পার হতে পারবেন!

ভাস্বতী স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, আমরা একবার মন্দিরে যাবো না? রঞ্জন কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বললো, আর মন্দিরে গিয়ে কি হবে? বেশ তো অ্যাডভেঞ্চার হলো। এখন ফিরে যাওয়া দরকার। গাড়িটা গ্যারেজে পড়ে আছে, কি করলো না করলো–

–বাঃ, এতখানি এসে মন্দিরটা না দেখে ফিরে যাবো?

–এসব মন্দিরে দেখার কি আছে? সবই তো একই রকম।

–প্রসেনজিৎ একটু ঠাট্টার সুরে ভাস্বতীকে বললো, মন্দিরে পুজো না দিয়ে গেলে মনটা খুঁত খুঁত করবে, তাই না? এসব সংস্কার সহজে যায় না মেয়েদের।

ভাস্বতী যে সামান্যতম বিদ্রুপ সহ্য করতে পারে না, তা প্রসেনজিৎ এখনো বোঝে নি। সে ঝংকার দিয়ে বললো, পুজোটুজো কিছু নয়– আমি এমনিই মন্দিরটা দেখতে চাই।

–ঐ মন্দিরটার নাম স্বর্গ। স্বর্গের এত কাছ থেকে কি ফিরে যাওয়া চলে?

রঞ্জন বললো, সতী, ওখানে আর না গেলে। শুধু শুধু পন্ডশ্রম।

ভাস্বতী চোখ শাণিত করে বললো, তুমি যাবে না?

রঞ্জন তৎক্ষণাৎ গলার স্বর নরম করে বললো, চলো তাহলে। কিন্তু ফিরতে যদি দেরি হয়ে যায়–নদীর জল যদি আবার বাড়ে, তাহলে উল্টো দিকের রাস্তার আট ন,মাইল হেঁটে বাস ধরতে হবে। পারবে?

–পারবো। মন্দিরটা তো বেশি দূরে নয়, আমি একটু আগে দেখেছি।

রঞ্জন প্রসেনজিৎকে জিজ্ঞেস করলো, কতক্ষণ লাগতে পারে?

প্রসেনজিৎ বললো, আধ ঘন্টা, বড় জোর চল্লিশ মিনিট। তাতে মন্দিরের কাছাকাছি যেতে পারবেন। মন্দিরে উঠতে আরও সময় লাগবে–শেষ পর্যন্ত উঠতে পারবেন কিনা তাও সন্দেহ।

–কেন?

–শেষের রাস্তাটুকু খুব খারাপ। কয়েকটা পাথর হয় কেউ ইচ্ছে করে ভেঙে দিয়ে গেছে অথবা আপনিই ভেঙে পড়েছে। স্বর্গে পৌছোবার রাস্তা কি খুব সহজ হতে পারে?

–তা হলে আপনি কি অ্যাডভাইস করেন? আমাদের যাওয়া উচিত কি উচিত নয়?

–আমার মত হচ্ছে, আপনাদের না যাওয়াই উচিত। মন্দিরটার কাছে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ওপরে উঠতে পারবেন না। তাতে আপনাদের আরও মন খারাপ হবে।

–মন্দিরের ওপরে ওঠা এতই শক্ত?

–খুবই শক্ত।

–সতী শুনছো, শেষ পর্যন্ত মন্দিরে বোধহয় ওঠাই যাবে না তাহলে গিয়ে কি হবে?

ভাস্বতী আর তাকাচ্ছে না প্রসেনজিতের দিকে। প্রসেনজিৎ যেন ওরা চলে গেলেই খুশি হয়–এই রকম একটা ভাব। ভাস্বতী এতে অপমানিত বোধ করছে। এই কি সেই কালকের রাত্তিরের মানুষ?

সে চিবুক উঁচু করে দর্পের সঙ্গে বললো, আমি যাবোই।

রঞ্জন জানে তার স্ত্রীর জেদ। আর যুক্তি তর্ক তুলে লাভ নেই। সে হালকা গলায় বললো, তাহলে চট করে ঘুরে আসি! দুপুরের আগেই যদি ফেরা যায়–

ওরা দুজন হাঁটতে আরম্ভ করেছে, প্রসেনজিৎ দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। রঞ্জন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, একি, আপনি আসছেন না আমাদের সঙ্গে?

ভাস্বতী বললো, একটাই তো সোজা রাস্তা। ওঁর আসবার দরকার নেই। আমরাই যেতে পারবো। আমাদের জিনিসপত্রগুলো এখানেই রইলো, ফেরার সময় নিয়ে যাবো।

প্রসেনজিৎ বললো, একজন গাইড ছাড়া আপনারা যেতেই পারবেন না। একটু দাঁড়ান।

সে সরু চোখে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। রঞ্জন কাছে এসে বললো, কি দেখছেন?

–আরও কয়েকজন লোক নদী পার হচ্ছে।

ওরা এদিকেই আসবে কিনা দেখা দরকার।

এ কথায় ভাস্বতী ঘুরে দাঁড়ালো। পাহাড়ে এলে একটা অধিকার–বোধ জন্মায়। মনে হয় এই জায়গা শুধু আমাদের। অন্য কেউ এলে ভুরু কুঁচকে যায়, মুখ ফিরিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, আমাদের মতন আর কেউ আসে এখানে?

–মাস খানেক আগে আর একটা দল এসেছিল, চার–পাঁচজন পুরুষ আর স্ত্রীলোক। আমি তাদের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি।

–তার মানে?

প্রসেনজিৎ প্রশান্ত ভাবে হেসে বললো, আমি দরকার হলে ভয় দেখাতে ও পারি–আমাকে দেখলে সেটা বোঝা যায় না অবশ্য। এক এক সময় মনে হয়, এই পাহাটা আমার নিজস্ব। অন্য কারুকে সহ্য করতে পারি না। শীকালে শুনেছি অনেক তীর্থ –যাত্রী আসে–গতশীতকালে আমি ছিলাম না–এই শীতকালেও আমি থাকবো না।

–আমাদের ভয় দেখালেন না যে?

–আপনারা আমাকে সে সুযোগ দিলেন কোথায়? আমি আসবার আগেই তো আপনারা বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। আপনাদের যে কাল রাত্তিরে ফেরার উপায় ছিল না–সেটা এখন বুঝতে পেরেছেন তো?

–এখন মনে হচ্ছে সেটা এক হিসাবে সৌভাগ্যই–বিপদ নয়! না হলে এমন চমৎকার সময় কাটানো যেত না।

দশ–বারো জনের একটি দল নদী পার হবার জন্য নেমে পড়েছে। জলের মধ্যে তারা খলখল ছলছল করছে। এতদূর থেকে মানুষজনকে পুতুলের মতন ছোট দেখায়–কিন্তু নানা রকম রং দেখে মনে হয়, ঐ দলে কয়েকটি নারীও আছে।

ভাস্বতী বিরক্তির সঙ্গে বললো, বোধ হয় কোনো জায়গা থেকে এক দল পিকনিক করতে আসছে।

রঞ্জন বললো, তার মানেই তো হৈ, চৈ, ট্যানজিস্টার, কাগজের ঠোঙা –

–কিন্তু এত দূরের কারা পিক নিক করতে আসবে? আজ কি ছুটির দিন?

–আজ কি বার? কালকের রাতটুকু শুধু কেটেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমরা কতদিন ধরে এখানে আছি। প্রসেনজিৎ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নদীর দিকে। আপন মনেই বললো, যতদূর মনে হচ্ছে স্থানীয় লোক। আর একটু দেখা যাক। স্থানীয় লোক হলে এদিকে আসবে না।

রঞ্জন বললো, অত রং বেরং–এর পোশাক?

–আপনি সাদা জামা পরেন। ওরা রংই ভালোবাসে।

দলটি নদী পার হবার পরও ওপরে এরা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। পাহাড়ী রাস্তায় কোনো কলধ্বনি শোনা গেল না।

এক সময় প্রসেনজিৎ বললো, ওরা ওদিকে আসবে না, চলুন।

তিনজনে ওপরে উঠতে লাগলো। সকলেরই কান পেছন দিকে। একটু পরে ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে গেল।

বাড়ির সামনে পৌঁছে প্রসেনজিৎ তার সেই লম্বা লোহার চিমটেটা নিয়ে নিল হাতে।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, এখনও কি সাপ–টাপ ধরবেন নাকি?

–যার যা কাজ।

–যাবার রাস্তায় সাপ–টাপ পড়বে?

–সম্ভবত না। আপনাকে বলেছি তো, এখানাকার সাপ আমি প্রায় শেষ করে এনেছি। আচ্ছা, এক কাজ করুন। আপনি পায়ে ও' পড়ে নিন। আর উনি–

রঞ্জন সকালবেলা খালি পায়েই বেরিয়ে পড়েছিল। ভাস্বতীও খালি পায়ে হেঁটে বেশ আনন্দ পাচ্ছে। বহুদিন পরে–।

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীকে বললো, আমার কাছে বিশেষ ধরনের খাঁজ–কাটা গাম বুট আছে। তাতে পাহাড়ে চড়তেও অসুবিধে হয় না, আর সাপের ভয়ও থাকে না।

ভাস্বতী বললো, আমি তো সাপের ভয় পাই নি।

–তা হলেও পরে নিন।

প্রসেনজিৎ ছুটে গাম বুট জোড়া নিয়ে এলো। তার জুতোর দোকানের কর্মচারীর মতন ঝটিতি ভাস্বতীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বললো, দিন, পা দিন।

ভাস্বতী লজ্জা পাচ্ছে। আরক্ত মুখে বললো, দুর, শাড়ি পরে কি এসব পায়ে দিয়ে হাঁটা যায়?

রঞ্জন সকৌতুকে বললো, বেল বটম পরে এলেই পারতে। অন্তত শালোয়ার কামিজ-বেড়াবার সময়ই তো ওসব পরলে বেশি মানায়-

প্রসেনজিৎ নাছোড়বান্দা। না পরিয়ে সে ছাড়বে না। ভাস্বতী পা গলিয়ে দিল। ভাস্বতীর পায়ের গুলফে যে প্রসেনজিতের হাত কয়েক মুহূর্তে বেশি থেমে ছিল, তা ভাস্বতী ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ জানবে না। তবু, এতে তেমন দোষ দেওয়া যায় না। অন্যের সামনেই যে পায়ে হাত দেয়, সে কয়েক মুহূর্ত বেশি সময় লাগালো কিনা সেটা বিচার্য নয়।

ভাস্বতী সেই জুতো পরে ধপ ধপ করে কয়েক পা হাঁটলো। রঞ্জন বুক ভরে হাসতে হাসতে বললো, তোমাকে যা অদ্ভুত দেখাচ্ছে-দাঁড়াও, ক্যামেরাটা নিয়ে আসি।

ভাস্বতী পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে জুতো দুটো খুলে ফেলে বললো, ধুৎ! এ আমি পারবো না। আমি খালি পায় হাঁটবো।

রঞ্জন বললো, সেই ভালো।

রঞ্জন দৌড়ে ফিরে গেল ক্যামেরাটা নিয়ে আসবার জন্য।

এখন আবার প্রসেনজিৎ আর ভাস্বতী একা।

ভাস্বতী নিচু হয়ে একটা ঘাস ফুল ছিড়ে জিজ্ঞেস করলো, আমাদের সঙ্গে যেতে হচ্ছে বলে কী আপনার কাজ নষ্ট হচ্ছে?

-না তো!

-মনে হচ্ছে, আমরা ওপরের দিকে না গেলেই আপনি খুশি হন?

-আমি সুবিধে অসুবিধেগুলো আপনাদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলুম।

তা ছাড়া, আপনাদের যখন ফেরার টান রয়েছে।

-মন্দিরটা দেখবো বলেই এসেছি। না দেখে ফিরে যাবো কেন?

-যদি পুজো দিতে চান, দুর থেকেই পুজো দিতে হবে। কাছে বোধহয় যেতে পারবেন না।

-পুজো দিতে নয়, দেখতে এসেছি।

রঞ্জন ক্যামেরাটা নিয়ে ফিরে এসে খচাখচ কয়েকটা ছবি তোলে। শুধু ভাস্বতীর নয়, প্রকৃতির ছবিও নিতে সে ভালবাসে। প্রসেনজিৎ কিন্তু ক্যামেরার দিকে তাকায় না। রঞ্জন তার ছবি তোলার চেষ্টা করলেও সে মুখ ফিরিয়ে থাকে।

এগিয়ে এসে ভাস্বতীর হাত ধরে রঞ্জন বললো, চলো দৌড়োই! দৌড়াবে? বেশ চমৎকার সকালটা।

প্রসেনজিৎ বললো, পাহাড়ে ওঠবার সময় আস্তে আস্তে যেতে হয়।

যেন ওরা দু'জনে মুহূর্তের জন্য ভুলে গিয়েছিল যে এখানে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি আছে। রঞ্জন ভাস্বতীর হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, ঠিক! স্লো, বাট স্টেডি-।

ভাস্বতী তবু আগে আগে হেঁটে যায়। তার পায়ে লঘু ছন্দ।

মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে দ্রৌপদীই প্রথম অবসন্ন হয়েছিলেন। আজ এই ক্ষুদে স্বর্গে ভাস্বতীই আগে পৌঁছতে চায়।

একটু পেছনে পাশাপাশি রঞ্জন আর প্রসেনজিৎ। তারা নিঃশব্দে সামরিক বাহিনীর পদস্থ অফিসারের মতন হাঁটছে পা মিলিয়ে মিলিয়ে। শুধু প্রসেনজিতের হাতের চিমটেটা মাটিতে ঠুকে শব্দ হচ্ছে ঠং ঠং।

রঞ্জন কখনো পাহাড়ে ওঠা উপভোগ করে না, কিন্তু আজ তার মন বেশ প্রফুল্ল। বহুদিন পর সে এক সকালে দাড়ি না কামিয়ে ময়লা জামা পরে একটা অচেনা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। সে যেন অন্য মানুষ। কে না মাঝে মাঝে অন্য মানুষ হতে চায়?

রঞ্জন বললো, দেখি, আপনার ঐ জিনিসটা দেখি তো!

প্রসেনজিৎ সেটা রঞ্জনের হাতে তুলে দিল।

–বেশ মজবুত জিনিস তো। কোন্ কোম্পানি তৈরী করে?

–স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বানানো।

–এই দিয়ে সব সাপ ধরা যায়? আপনি পাইথনও এদিয়ে ধরতে পারবেন?

–এখানকার পাইথন বেশ বড়। সেগুলোকে প্রথম প্রথম একা একা ম্যানেজ করা একটু শক্ত। তবে যদি চোখে পড়ে যায়, তবে নিস্তার পাবে না। পাইথন তো এমনিতে খুব অলস–সহজে পালাতেও পারে না, দেখতে পেলে ব্যাটাকে আর ছাড়বো না। দেখছেন তো, চিমটের ওপর দিকে স্ক্রু লাগানো আছে। চিমটেটা দিয়ে ওর মাথাটা চেপে ধরে স্ক্রু টাইট করে ওটা সুদ্ধু ছেড়ে দিয়ে আসবো। তাতে ও আর পালাতেও পারবে না, নির্জীব হয়ে পড়ে থাকবে। তারপর হরদয়াল এলে দু'জনে এক সঙ্গে বাঁধবো।

রঞ্জন হঠাৎ কোমরে হাত দিয়ে বললো, এই রে!

রঞ্জনের কোমরে বেল্ট নেই।

প্রসেনজিৎ জিজ্ঞেস করলো, কি হলো?

–বেল্ট সুদ্ধু আমার অস্তরটা ফেলে এসেছি।

–ভয় নেই, চুরি যাবে না। আমার রাইফেলও তো রয়েছে!

–সেজন্য বলছি না। যদি দরকার –টরকার লাগে–

–দিনের বেলা আবার কি দরকার লাগবে?

–কথার কথা বলছি, যদি পাইথনটাই সামনে পড়ে যায়?

–পাইথনটাকে আপনি গুলি করতেন নাকি? তা হলে আমি এতদিন এখানে বসে আছি কেন? আপনি পাইথনটাকে গুলি করতে গেলে আমিই আপনার রিভলবারের সামনে বুক পেতে দিতাম। ওরকম একটা দামী জিনিস, ওটার জন্য আমি এত কষ্ট করে এই পাহাড়ে পড়ে আছি। আপনার ভয় নেই, আমার হাতে যতক্ষণ এই চিমটেটা আছে, ততক্ষণ কোনো পাইথনই কিছু করতে পারবে না। তা ছাড়া, পাইথন সাধারণতঃ বেশি উঁচুর দিকে থাকে না। আমার ধারণা ও নদীর ধারেই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। ব্যাটা বুঝতে পেরেছে যে ওর যম ঘুরছে এই পাহাড়ে।

–ওরা ওপরে কখনো আসে না?

–কখনো আসে না, এ কথা বলা যায় না। বাকি তিনটেকে আমরা পাহাড়ের নিচের দিক থেকেই ধরেছি। এখন এটা যদি প্রাণ বাঁচার জন্য ওপরে এসে থাকে।

রঞ্জনের মন তবু খুঁত খুঁত করে। সে বললো, তবু ওটা আনলে হতো। পাখি–টাখি বা খরগোশ শিকার করা যেত। সহজে তো চান্স পাওয়া যায় না।

–আমিও সেটা ভেবেছিলাম। কিন্তু সঙ্গে দয়ালু মহিলা থাকলে শিকার করা মুশকিল হয়। দেখলে না, তখন খরগোশটাকে অত কাছাকাছি পেয়েও উনি মারতে দিলেন না।

ভাস্বতী অনেকটা এগিয়ে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে কখনো তাকে দেখা যায়, কখনো দেখা যায় না। ক্রমশ জঙ্গল ঘন হয়ে আসছে। গাছপালা বৃষ্টি ধোয়া, চিক্কণ সবুজ। চতুর্দিকে একটা ঝকঝকে তকতকে ভাব। এখানে ফলের সমারোহও চোখে পড়ে। দেখা যায় দু'–একটা অচেনা জাতের পাখি।

প্রসেনজিৎ বললো, ঠিক আছে, আমি দাঁড়াচ্ছি, আপনি বেল্টটা পরে আসুন।

দূরে অপসৃয়মান ভাস্বতীর দিকে তাকিয়ে রঞ্জন বললো, থাক। আবার এতখানি ফিরে যাবো।

–নিয়ে আসুন না। কতক্ষণ আর লাগবে?

–না, দরকার নেই যখন – শুধু শুধু বয়ে বেড়াবার কি মানে হয়!

রঞ্জন চেঁচিয়ে ডাকলো, এই সতী, দাঁড়াও।

ভাস্বতী এক জায়গায় ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে, সংগ্রহ করছে পথের ফুল। ওরা কাছে আসতে ভাস্বতী বললো, এগুলো কিসের দাগ বলো তো!

রাস্তা অনেক সরু হয়ে এসেছে। রাস্তার পাশে একটা নালার মতন– এখন জল নেই, বালি ভিজে ভিজে। সেখানে ছাগলের পায়ের ছাপের মতন কয়েকটা গভীর দাগ।

প্রসেনজিৎ বললো, দেখে মনে হচ্ছে নীল গাই।

রঞ্জন বললো, এই শ্রীমানই তা হলে কাল রাত্তিরে আমাদের জ্বালিয়ে ছিল। রাত্তিরে ঘুমোতে দেয় নি।

–শ্রীমতীও হতে পারে।

–ভাস্বতী জিজ্ঞেস করলো, নীল গাই প্রানীটা আসলে ঠিক কি রকম?

অনেকটা হরিণ আর গরুর মাঝামাঝি। কিংবা মস্তবড় ছাগলও বলতে পারেন। তবে শুনেই বুঝতে পারছেন, ঐ তিনটেরই মতন নিরীহ। ভয়ের কিছু নেই।

–কখনো দেখি নি।

–দিনের বেলা দেখতে পাওয়া খুবই দুষ্কর। বোধ হয় ছুটকে এসে পড়েছিল।

–আপনি এই পাহাড়ে এতদিন আছেন, আপনি কখনো দেখেন নি?

–না, পাহাড়ী জঙ্গল ভারী অদ্ভুত জায়গা। সাপের খোঁজে আমি এই পাহাড়ের সব জায়গা বেশ কয়েবার তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি– তবু এখনও অনেক কিছু আমার নজর এড়িয়ে আছে। পাইথনটার কথা তো বললামই। তাছাড়া, আমি জানি, এই পাহাড়ে একটা বা দুটো শেয়াল আছে, মাঝে মাঝে ডাক শুনেছি, কিন্তু একবারও চোখে দেখিনি। এরকম আরও কত কি আছে কে জানে মাঝে মাঝে দু' একটা অপূর্বসুন্দর প্রজাপতি বা মথ দেখি–কোথা থেকে যে তারা আসে, তাই বা কে জানে! ভাস্বতী বললো, আমরা সে –রকম কিছুই দেখতে পেলাম না।

রঞ্জন বললো, একদিনেই কি তুমি সব দেখে নিতে চাও?

–কাল বৃষ্টি –টিষ্টি পড়ার পর আমার ভালো লাগছিল না–আজ সকালবেলা কিন্তু এ জায়গাটা আমার খুব ভালো লাগছে! এরকম সকালবেলা আমি কখনো কোনো পাহাড়ে উঠি নি। একবার শুধু সেই ছেলেবেলায় যখন দেওঘরে গিয়েছিলাম–খুব সকালে উঠে নন্দন পাহাড়ে যেতাম।

–ওটা আবার পাহাড় নাকি? একটা টিলা–

প্রসেনজিৎ সন্ধানী চোখে এদিক –ওদিক তাকালো। তারপর ভাস্বতীর বাহু ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বললো, আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, আর এইটাই চোখে পড়ে নি? এই জন্যই জুতোটা পরে আসতে বলেছিলাম।

রঞ্জন ও তখন দেখতে পেয়েছে। সে ভাস্বতীকে আড়াল করে চাপা গলায় বললো, সাপ!

ভাস্বতী বিচলিত হলো না। বললো, জ্যান্ত ? না, মরা মনে হচ্ছে?

ভিজে বালির ওপর এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে একটা হলুদ হলুদ রঙের সাপ।

রঞ্জন প্রসেনজিৎকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এটা ধরবেন না? খাঁচা টাচা তো কিছু আনেন নি?

প্রসেনজিৎ হাসিমুখে বললো, এবার আপনাদের আমার কায়দাটা দেখাতে হচ্ছে। কখনো তো দর্শক পাই না।

সে চিমটেটা বাগিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেল। ওদের খানিকটা উত্তেজনা দেবার জন্যই যেন সাপটা চট করে ধরা দিল না। প্রসেনজিৎ কাছাকাছি যেতেই সেটা নড়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করলো। যেন সে প্রসেনজিৎকে চিনতে পেরেছে।

বেড়াল যেমন ইঁদুর নিয়ে খেলা করে, সেই রকম ভাবে প্রসেনজিৎ সাপটার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে লাগলো, কখনো সামনে, কখনো পেছনে। একবার ক্যাঁক করে চেপে ধরলো তার মুন্ডুটা। সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে উঁচু করে তুললো, যাতে সে শরীর দিয়ে কিছু প্যাঁচাতে না পারে। শুন্যে হিলবিল করতে লাগলো সাপটা।

ছেলেমানুষের মতন ভয় দেখাবার জন্য প্রসেনজিৎ চিমটে সুদ্ধ সাপটাকে নিয়ে এলো ওদের খুব কাছে। স্নায়বিক প্রতিক্রিয়ায় ওরা পিছিয়ে গেল কয়েক পা।

প্রসেনজিৎ বললো, ভয় নেই, এটার বিষ নেই।

ভাস্বতী বললো, কি করে বুঝলেন?

-এইটাই আমার পেশা।

-বিষ না থাক, এটাকে সরিয়ে নিন তো। সাপ দেখতে আমার বিচ্ছিরি লাগে।

-এর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখুন। কোনো হিংস্রতা নেই। সাপ তো আসলে হিংস্র প্রাণী নয়। মানুষ তো খাদ্য নয় সাপের!

-কিন্তু পাইথন! পাইথন শুনেছি মানুষ গিলে ফেলে।

-পাইথনের ব্যাপারটা আবার আলাদা। পাইথনকে ঠিক সাপ বলা যায় না- কারণ ওদের বিষ নেই। ওরা একটা আলাদা ধরনের সাঙঘাতিক প্রাণী।

-পাইথন কি সাঙঘাতিক প্রাণী?

-নিশ্চয়ই। ছেলেবেলায় পড়েন নি, 'অ-য় অজগর আসছে তেড়ে'।

প্রসেনজিৎ হাতের চিমটেটা তখনও দোলাচ্ছে।

রঞ্জন জিজ্ঞেস করলো, এখন এটাকে নিয়ে কি করবেন?

সাপটার রঙ হলুদ,গায়ে কালো কালো ছোপ। শুন্যে সেটাকে কিছুক্ষণ খেলাচ্ছলে দুলিয়ে প্রসেনজিৎ বললো, এসব সাপ আমার কোনো কাজে লাগে না।

টপকে নালাটা পার হয়ে সে খানিকটা হেঁটে গিয়ে চলে গেল পাহাড়ের কিনারে, যার ওপাশে ঢালু উপত্যকার মতন। প্রসেনজিৎ হাতটা দুলিয়ে বহু উঁচুতে ছুঁড়ে দিল সাপটাকে। সেটা শুন্যে ঘুরতে ঘুরতে পড়ে গেল অনেক নিচে।

ভাস্বতী চেঁচিয়ে বললো, একি, ওটাকে মারলেন না?

ফিরে আসতে আসতে প্রসেনজিৎ বললো, বিষ নেই, ওটাকে মেরে কি হবে? সাপের ওপর এমনি আমার কোনো জাতক্রোধ নেই। নেহাত ব্যবসার খাতিরে ধরি।

-তবু সাপ কেউ না মেরে ছেড়ে দেয়, আমি কখনো দেখি নি!

-আপনি তখন খরগোশটাকে মারতে বারণ করলেন, আর এটা কি এমন দোষ করলো। তা ছাড়া, যে-সব সাপের বিষ নেই, সেগুলো দেখলেই আমার ঘেন্না হয়।

রঞ্জন বললো, অধিকাংশ সাপেরই তো বিষ থাকে না, বইতে পড়েছি। প্রসেনজিৎ একটু বাঁকা ভাবে বললো, ঠিকই বলেছেন। বই পড়েও অনেকটা সত্যি কথা জানা যায় বটে।

অর্থাৎ যে বনে -পাহাড়ে ঘুরে সে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করছে, সামান্য বইয়ের পাতা থেকেই সেটা অন্য কারুর জেনে নেওয়া তাঁর পছন্দ হয় না। নিজস্ব পেশা সম্পর্কে অনেকেরই গর্ব থাকে।

রঞ্জন শ্লেষটা বুঝতে পারলো। কিন্তু নিজের গলার একটুও শ্লেষ না ফুটিয়ে সে বললো, ঐ সাপটার যে বিষ নেই, এটা আপনি আগে দেখেই বুঝতে পারেন নি!

–বুঝেছিলাম। এই ঢোঁড়া সাপগুলোই এখানে বেশি।

রঞ্জন চুপ করে গেল। ঠোঁটে তার পাতলা হাসি। সাপটার বিষ নেই জেনেও ছেলেটি লাফালাফি করে ওটাকে ধরে নিজের একটু কৃতিত্ব দেখালো। সঙ্গে কোনো মহিলা থাকলে এই রকম হয়। ভাস্বতীর বদলে যদি এখানে অন্য কোনো মহিলা থাকতো, তা হলে সে নিজেও কি খানিকটা চাঞ্চল্য দেখাতো না! নিজের স্ত্রীর সামনে বীরত্ব কিংবা বাহাদুরি দেখাবার স্তর সে অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে।

আর একটুক্ষণ হাঁটবার পর ভাস্বতী বললো, জায়গাটা কিন্তু ভারী সুন্দর। লোকেরা যে এই জায়গাটাকে মনে মনে স্বর্গ বানিয়েছে, তার একটা কারণ আছে। এমন চমৎকার পাহাড় আমি আগে কখনো দেখি নি। কতরকম ফুলের গন্ধ।এখানে না এলে খুব বোকামী করতুম।

রঞ্জন চুপ করে আছে দেখে ভাস্বতী বললো, তুমি তো আসতেই চাইছিলে না। এখন তোমার ভালো লাগছে না?

–সত্যি ভালো লাগছে।

–আর একটা ব্যাপার লক্ষ করেছো? একটুও হাঁপিয়ে যাই নি।

পাহাড়টা সত্যিই একটু অন্যরকম– চারপাশটা এত সুন্দর বলে ওপরে ওঠার কষ্টের কথা মনেই পড়ে না।

রঞ্জন বললো, এ জায়গায় বিশেষ কেউ আসে না বলেই এত সুন্দর আছে। দেখবে হয়তো কিছুদিন বাদে একটা টুরিস্ট লজ তৈরি হয়ে গেছে। তখন আর–

প্রসেনজিৎ বললো, মন্দিরটা আর বেশি দূরে নেই। এ জায়গাটাকে এখানকার স্বর্গের নন্দন কানন বলতে পারেন।

–নন্দন কাননে কি সাপ থাকে?

–বাইবেলের নন্দন কাননে ছিল।

ভাস্বতী শাড়ীটা গাছকোমর করে পরেছে। তার মুখে রোদ্দুরের আভা। তার বরবর্ণিনী শরীরটি এই অরণ্যে কি সাবলীল। তার ত্বকের প্রতিটি রন্ধ্র দিয়ে সে যেন আনন্দ শুষে নিচ্ছে।

হাতে এক গোছা ফুল, সেগুলো রঞ্জনের হাতে দিয়ে সে বললো, এগুলো ধরো তো–আমি ঐ পরগাছার সাদা ফুলগুলো পাড়বো।

–তুমি গাছে উঠবে?

–কেন, উঠতে পারি না ভেবেছো?

–দাঁড়াও, আমি পেড়ে দিচ্ছি।

তার আগেই প্রসেনজিৎ হাতের চিমটেটা নামিয়ে রেখে গাছে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। সেখান থেকে বললো, কত ফুল চাই, সব পেড়ে দেবো?

রঞ্জন আবার নিঃশব্দে হাসলো। ছেলেটির উৎসাহের অন্ত নেই।

যুবতী নারী, একটু যদি সুন্দরী হয়,তাহলে চিত্তবিপ্লব তো ঘটাবেই। রঞ্জকে সুযোগ না দিয়েই ও গাছে উঠে গেছে। রঞ্জন একটি অফিসের এক্সিকিউটিভ হতে পারে, তা বলে নিজের স্ত্রীর জন্য ফুল পেড়ে দিতে পারবে না, এমন তো নয়। বিয়ের আগে যখন ভাস্বতীর সঙ্গে তার প্রণয়পর্ব চলছিল, তখন সে ভাস্বতীর জন্য এরকম কত কি করতো। তখন সে ছিল প্রেমিক, এখন স্বামী। অনেক তফাত। যখন সে প্রেমিক ছিল, তখন ভাস্বতীর কাছাকাছি অন্য কোনো পুরুষ দেখলে সহ্য করতে পারতো না।

অন্য কোনো ছেলে ভাস্বতীর সঙ্গে কথা বললে তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠতো। এখন সে স্বামী, এখন উদার প্রশ্রয়ই তাকে মানায়।

প্রসেনজিৎ এক গাদা ফুল নিয়ে নেমে আসতেও ভাস্বতী তৃপ্ত-হলো না। আর একটা গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললো, ঐ নীল কয়েকটা-

এবার সে রঞ্জনকে কিছু বলে নি, প্রসেনজিতকেই সরাসরি অনুরোধ জানিয়েছে।

বারবার একটি মেয়ের কথায় গাছে ওঠা যে বোকামির মতন দেখায় এটা প্রসেনজিৎ বোঝে। তাই সে বললো, আর ফুল কি হবে? পুজো দেবেন তো?

-না, পুজোর জন্য না।

-হ্যাঁ, এই ফুলগুলো পুজোতেই দিন। আপনার নিজের জন্য ফুল ফেরার পথে পেড়ে দেবো। এখানকার পুজোতে শুধু ফুল দিলেই চলে -মন্দিরে তো পুরুত নেই, সুতরাং চাল কলা কিংবা টাকা-পয়সা লাগে না।

-আমি পুজো দিতে চাই না।

-এসেছেন যখন দিয়ে যান না। অন্যরা মন্দিরের নিচেই পুজো দেয়- আপনি একেবারে ওপরে উঠে পুজো দেবেন। আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হবেই। অবশ্য যদি উঠতে পারেন।

-উঠতে পারবো না?

-দেখা যাক। খুব কঠিন।

-আমি মন্দিরটা দেখতে চাই। এসেছি যখন, একেবারে শেষ পর্যন্ত না যাওয়ার কোনো মানে হয় না। পুজো দেওয়ার ব্যাপারে আমার আগ্রহ নেই।

-শীতকালে, শুনেছি, প্রত্যেকদিন চার-পাঁচশো করে লোক আসে পুজো দেবার জন্য।

রাস্তাটা একটা বাঁক ঘুরতেই ওরা খাদের সামনে চলে এলো। এক পাশে খাড়া পাথর, আর এক পাশে খাদ। খাড়া পাথরের গা দিয়ে সরু পথ, তা-ও অনেকদিন লোক-চলাচল হয় নি বলে পথের ওপর ঝোপ-ঝাড় হয়ে আছে।

রঞ্জন বললো, বাবাঃ, এখানে দিয়ে যাওয়া যাবে কি করে?

প্রসেনজিৎ বললো, এখান দিয়ে যাওয়া খুব শক্ত নয়। দেয়ালে পিঠ দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে গেলেই হবে। মন্দিরের কাছাটায় সত্যিই বেশ ভয় আছে। ইচ্ছে করলে, এখান থেকেও ফিরে যাওয়া যায়। ঐ তো মন্দির দেখা যাচ্ছে। আর গিয়ে কি হবে!

রঞ্জন ভাস্বতীর দিকে পলক তাকিয়ে বললো, এত দূর এলাম যখন, যাওয়াই যাক।

প্রসেনজিৎ সট্ করে ভাস্বতীর দিকে ফিরে বললো, যাবেন?

-হ্যাঁ।

-তাহলে আমার পেছনে পেছনে আসুন। সব সময় সামনে তাকাবেন।

এটা যদি গাড়ির রাস্তা হতো এবং রঞ্জন বসতো ষ্টিয়ারিং হাতে নিয়ে

-তা হলে যে-কোনো বিপজ্জনক দূরত্ব সে পার হতে পারতো অনায়াসে কৃতিত্বে। কিন্তু পায়ে হেঁটে পাহাড়ে ওঠার ব্যাপারে তার কোনো দক্ষতাই নেই। বরং খাদের দিকে তাকিয়ে তার একটু ভয় ভয় করছে। এখানে ঐ ছেলেটির ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

প্রসেনজিৎ আগে আগে গেল, হাতের চিমটেটা দিয়ে ঝোপঝাড়ের ওপর প্রচন্ড বাড়ি মারতে মারতে। গাছগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে রাস্তা করে দিল ওদের। দেখে যা মনে হয়েছিল, রাস্তাটা তার থেকে চওড়া, অনায়াসে পা রাখা যায়।

ভাস্বতী শক্ত করে ধরে আছে রঞ্জনের হাত। ঝোপঝাড়ের জন্যই বেশি অসুবিধে হচ্ছে পা ফেলতে।

রঞ্জন ভাস্বতীকে বললো, এই রাস্তায় তুমি কাল রাত্তিরে আসতে চেয়েছিলে?

ভাস্বতী বললো, দেখে মনে হচ্ছে, অনেকদিন এই রাস্তা দিয়ে কেউ যায় নি।

প্রসেনজিৎ বললো, বর্ষকালে বিশেষ কেউ আসে না। নিচের দিকে তাকাবেন না! দেয়াল ধরে থাকুন, আমি গাছ পরিষ্কার করে দিচ্ছি। শেষ ঝোপটায় বাড়ি মারতেই প্রসেনজিতের হাত থেকে ফসকে গেল চিমটেটা। সেটাকে আর ধরার কোনো উপায় নেই। প্রসেনজিৎ এত জোরে সেটা চালিয়েছিল যে, সেটা বিদ্যুৎগতিতে লাফ দিল শুন্যে, পড়ে গেল নিচে, অকেন নিচে- ঝনঝন ঝনঝন শব্দ হলো গড়িয়ে পড়ার।

প্রসেনজিতের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে শুধু বললো, যাঃ।

রঞ্জন উৎকণ্ঠিত ভাবে বললো, জিনিসটা গেল? আপনার হাতিয়ার !

ভাস্বতী বললো, ওটা আর পাওয়া যাবে না?

শুকনো ভাবে প্রসেনজিৎ বললো, নিচ দিয়ে ওদিকে আর একটা রাস্তা আছে-কাল খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু এখন তো আর পাওয়া যাবে না।

ভাস্বতী বললো, যাক, পরে তো পাওয়া যাবে!

প্রসেনজিৎ বিমর্ষভাবে বললো, ঠিক আছে, আসুন।

এর পর রাস্তাটা একটু ভালো। মন্দিরটা এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু রাস্তাটা এখানে ঘন ঘন বাঁক ঘুরতে হয়, সুতরাং মন্দিরটা এক একবার চোখের আড়ালে চলে যায়। যাবার পথে দেখা যাচ্ছে।, ভাঙা হাঁড়ি কলসী। পচা ফুল ও পাতাপাতা পড়ে আছে এখানে সেখানে। গত শীতের তীর্থ যাত্রীদের চিহ্ন। এক জায়গায় নিচু হয়ে প্রসেনজিৎ কয়েকটা খুচরো পয়সা তুলে নিল। হাসতে হাসতে বললো, আদিবাসীরা অনেকে এখানে পয়সা কড়িও দিয়ে যায়। আমাদের দেশে পুণ্য অর্জনের সঙ্গে টাকা -পয়সার খুব সম্পর্ক আছে তো! প্রথমবার এসে আমি আর হরদয়াল অনেক সিকি আধুলি পেয়েছিলাম।

আর একটা বাঁক ঘুরতেই মন্দিরটা খুব কাছে এসে গেল। প্রসেনজিৎ বললো, এইখানটাই আসল কঠিন জায়গা।

।।৯ ।।

রঞ্জন ওপরের দিকে তাকিয়ে বললো, মন্দিরটা দেখতে তো বেশ ইন্টারেস্টিং। এরকম সুন্দর হবে ভাবি নি। ভেবেছিলাম সাধারণ ইট সুরকির মন্দির যে রকম হয়। বেশ পুরোনো মনে হচ্ছে।

প্রসেনজিৎ বললো, আদিবাসীদের বিশ্বাস-এটা দেবতাদের নিজের হাতে বানানো। এই নিয়ে অনেক গল্প আছে।

গল্প শোনার আগ্রহ নিয়ে ভাস্বতী প্রসেনজিতের দিকে তাকালো। কিন্তু সে আর কিছু বললো না। গল্প বলার স্বভাবও তার নয়।

হিন্দু মন্দিরের চূড়া যেমন গম্বুজ ধরনের হয়, এ মন্দির সেরকম নয়। বড় বড় পাথরের টুকরো বসিয়ে একটা ত্রিকোণাকৃতি ঘরের মতন-পাথরগুলোতে বহুকালের সবুজ পুরু শ্যাওলা জমে আছে। বজ্রপাত আটকাবার জন্য যে-রকম লোহার ফলক বসানো হয়, ওপরে সেইরকম একটি ফলক। মন্দিরের পেছন দিকটা দেখা যায় না,মনে হয় অনেকখানি জায়গা আছে।

রঞ্জন বললো, এত বড় পাথর এত উঁচুতে নিয়ে গেল কি করে?

তাছাড়া ঐরকম চৌকো চৌকো করে পাথরগুলো কাটাও তো আশ্চর্য ব্যাপার। অনেক কাল আগের ব্যাপার যদি হয়-

প্রসেনজিৎ বললো, কিছু লোক যখন এ জায়গাটাকে স্বর্গ বলে বিশ্বাস করে-তখন কিছু রহস্য তো থাকবেই। ওপরে একটা লম্বা গাছ দেখছেন? গাছটার গা সাদা রঙের-অনেকটা

ইউক্যালিপটাস ধরনের–কিন্তু ইউক্যালিপটাসে অত বড় বড় ফুল হয় না। ঐ রকম গাছ এ পাহাড়ে কেন, এই তল্লাটে আর কোথাও নেই। এটাও একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

রঞ্জন সহাস্যে বললো, এটাই কি পারিজাত নাকি?

–আমি তো আসল পারিজাত দেখি নি, জানবো কি করে? তবে ঐ ফুলগুলোর গন্ধ নেই।

ভাস্বতী জিজ্ঞেস করলো, ওপরে ওঠা যাবে না?

–সেইটাই তো সমস্যা।

পাহাড়ের ওপরে মন্দির, কিন্তু ওপরে ওঠার কোনো পথ নেই। মন্দিটার সামনে চাতালের মতন জায়গা বেশ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে– হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেছে। মাঝখানে একটা মস্ত বড় ফাঁক।

ওরা যে–পথ ধরে এসেছে, সেই পথটি পাহাড়ের একেবারে এক প্রান্তে। ডান দিকে অনেক নিচু খাদ। বাঁ দিকে পাহাড়ের গা খাড়াভাবে উঠে গেছে। মন্দিরের চাতালে পৌঁছোতে হলে মাঝখানের গর্তটা পার না হয়ে উপায় নেই। মনে হয়, ঐ গর্তের মতন জায়গাটায় কয়েক ধাপ সিঁড়ি ছিল কোনো সময়ে–কোনো প্রাকৃতিক কারণে সেটা ভেঙে পড়েছে। মন্দিরে পৌঁছবার পথ এখন দুর্গম, অনেকের কাছে অসাধ্য। গর্তটা পার হওয়াই শুধু বড় কথা নয়– চাতালের মতন জায়গাটা এমন ঢালু যে, সেখানে পা রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ানোই শক্ত, যে কোনো মুহূর্তে গড়িয়ে পড়ার সম্ভবনা। আর, গড়িয়ে গর্তে পড়লে মৃত্যু অবধারিত।

চাতালটা এরকম ঢালু হবার কারণও সম্ভবত কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হয়তো ভূমিকম্প। চাতালের এক দিকটা পরিস্কার মসৃণ, আর একদিকে কয়েকটা বড় বড় গাছ ও ঝোপঝাড় হয়ে গেছে, একটা গুহার মতনও রয়েছে মনে হয়।

রঞ্জন মাঝখানের গর্তটার কিনারায় এসে নীচে উঁকি দিল। গর্তটা অনেক দূর নেমে গেছে, তাকালে মাথা ঘুরে যায়। সে প্রসেনজিৎকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি মন্দিরটাতে উঠেছেন আগে?

প্রসেনজিৎ বললো, বার তিনেক গেছি। প্রথমবার আমারও খুব ভয় হয়েছিল–কিন্তু আমার সঙ্গে যে থাকে, হরদয়াল, ও একেবারে গিরগিটি টিকটিকির মতন পাহাড়ে উঠতে পারে। ও থাকলে কোনো চিন্তাই ছিল না।

ভাস্বতী আর রঞ্জন পরস্পরের চোখের দিকে উদ্বেগ নিয়ে তাকালো। কোনো কথা বললো না।

প্রসেনজিৎ বললো, কি, ওপরে যেতেই হবে? এখান থেকেই তো অনেকটা দেখা যাচ্ছে, এবার ফিরে গেলেও হয়।

–মন্দিরের মধ্যে কি আছে?

–বিশেষ কিছুই নেই। কয়েকটা পাথরের মূর্তি–টূর্তি। এমন কিছু দ্রষ্টব্য ব্যাপার নয়।

প্রসেনজিৎ রঞ্জনের দিকে ফিরে বললো, চলুন, ফিরে যাওয়া যাক।

রঞ্জন উত্তর না দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ব্যাপারটা একটা চ্যালেঞ্জের মতন। মন্দিরটায় যদি দেখার কিছু নাও থাকে, তবু ওটা না–দেখে ফিরে যাওয়ার মধ্যে একটু কাপুরুষতা আছে। মাঝখানের ফাঁকটা খুব বেশি বড় নয়–সুতরাং অসাধ্য ব্যাপার বলেও ফিরে যাওয়া যায় না।

সে ভাস্বতীকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কি ইচ্ছে?

ভাস্বতী বললো, যেতে খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু.....

প্রসেনজিৎ বললো, একটু যদি ঝুঁকি নিতে রাজী থাকেন তাহলে যাওয়া যায়।

–কি করে?

–আমি আগে লাফিয়ে ওপারে যাবো। তারপর ওদিক থেকে আপনাদেরক দু'জনকে ধরে ধরে পার করে নেবো।

–লাফিয়ে?

–লাফানোটা এমন কিছু শক্ত নয়। শক্ত হচ্ছে ওধারে গিয়ে সোজা হয়ে দাড়ানো। একটু পা পিছলোলেই নরকে পতন।

রঞ্জন বললো, সবচেয়ে সোজা হচ্ছে, যদি একটা মস্তবড় মই নিয়ে আসা যায়। এইখান থেকে মই পেতে ঐ মন্দিরে ওঠা মোটেই শক্ত নয়।

ভাস্বতী বললো, মই তুমি এখন কোথায় পাচ্ছো?

রঞ্জন আর একবার কিনারায় এসে গর্তটা পরীক্ষা করলো। গর্তটা হাত তিনেক চওড়া। খেলাধুলোয় অভ্যস্ত সাবলীল চেহারার পুরুষের পক্ষে লাফিয়ে পার হওয়া এমন কিছু কঠিন পরীক্ষা নয়। সমতল জায়গা হলে কোনো প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু ওদিকের পাথরের চেহারা খুব খারাপ।

–লাফিয়ে ওপারে গিয়ে ঐ ঢালু পাথরে পা রাখা যাবে?

–সেইটাই একটু শক্ত ব্যাপার। এইটুকু ঝুঁকি তো নিতেই হবে।

রঞ্জন বললো, ঠিক আছে, আমি আগে ওদিকে যাচ্ছি।

প্রসেনজিৎ হাত দিয়ে তাকে বাধা দিয়ে বললো, না।

–কেন?

–আপনার জীবনের দাম আছে।

–তার মানে? আপনার জীবনের দাম নেই?

প্রসেনজিৎ নিঃশব্দ হেসে ভাস্বতীর দিকে তাকলো। তারপর বললো, প্রত্যেকেরই জীবনের দাম আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন, আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রী রয়েছেন, আপনার যদি কিছু একটা হয়, উনি তখন কি করবেন?

ভাস্বতী এক পলক চোখ বুজে দৃশ্যটা ভাববার চেষ্টা করলো। রঞ্জন নিচে পড়ে গেছে, সে দাঁড়িয়ে আছে প্রসেনজিতের পাশে। ভাস্বতীর গা কেঁপে উঠলো।

রঞ্জন বললো, প্রত্যেকেরই জীবনের দাম সমান।

প্রসেনজিৎ বললো, এই পৃথিবীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন, এ কথা সত্যি নয়। এবং তা হওয়া সম্ভবও নয়। যাকগে সে কথা, আমি বলছি, আমার কিছু হবে না। এতবার আমার মরবার চান্স এসেছে, তাতেও যখন মরি নি–

রঞ্জন বললো, আপনি চিন্তা করবেন না, এটুকু লাফিয়ে পার হতে আমি পারবো।

–সেটা আমি জানি। কিন্তু ওদিকে গিয়ে যদি ব্যালেন্স না রাখতে পারেন– এরকম অ্যাকসিডেন্ট আগে এখানে হয়েছে নাকি কয়েকবার। আমি যা বলছি শুনুন, আমি আগে ওদিকে যাবো। তারপর আপনি এর কোমর ধরে এঁকে এগিয়ে দেবেন। ইনি পার হবার পর আপনাকেও লাফাতে হবে–ওদিক থেকে আমি আপনার হাত ধরে নেবো।

হঠাৎ ভাস্বতী বললো, থাক, যেতে হবে না।

রঞ্জন আর প্রসেনজিৎ দু'জনেই অবাক হয়ে তাকালো ভাস্বতীর দিকে।

সে যে–ধরনের মেয়ে, তার মুখ থেকে এই রকম কথা শুনবে, ওরা আশা করে নি।

তারগলার স্বর শুনলে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে প্রসেনজিতের কথা ভেবেই এরকম সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। ওপাশে গিয়ে প্রসেনজিৎও তো পা পিছলে পড়ে যেতে পারে। আগে পেরেছে বলে প্রত্যেকবারই যে পারবে তার কোনো মানে নেই।

প্রসেনজিৎ বললো, ভয় পাচ্ছেন?

–না, ভয় নয়।

–জীবনে এরকম ঝুঁকি তো নিতেই হয় মাঝে মাঝে।

ভাস্বতী বললো, না, এত ঝুঁকি নেবার কোনো মানে হয় না। ফিরে চলুন।

প্রসেনজিৎ এক কথায় রাজী হয়ে বললো, চলু তা হলে!

রঞ্জনই বরং ব্যাপারটাতে কৌতুক বোধ করলো, সে বললো, সতী, তুমি ভয় পেয়ে গেলে? আমাদের ছেলেপুলে নেই। পিছুটান নেই-- দু'জনে যদি একসঙ্গে মরে যাই,তাতে ক্ষতি কি?

ভাস্বতী চেয়ে রইলো মন্দিরটার চূড়ার দিকে।

প্রসেনজিৎ জুতো খুলে প্যান্ট গুটিয়ে নিল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললো, আপনার যাবার খুবই ইচ্ছে আছে বুঝতে পারছি। তা হলে যাওয়াই হোক।

একটু পিছিয়ে গিয়ে লাফ দিল খুব জোরে। গর্তটা পেরিয়ে গিয়ে আরও অনেকটা দূরে পৌঁছোলো। পৌঁছেই পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে, গড়িয়ে আসতে লাগলো নিচের দিকে। ভাস্বতী মুক চাপা দিয়েছে, রঞ্জন ভুলে যাচ্ছে নিশ্বাস ফেলতে।

প্রসেনজিৎ হ্যাচোড়-প্যাচোড় করে শেষ পর্যন্ত খামচে ধরে ফেললো পাথর। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো-শিশুর প্রথম হাঁটতে শেখার ভঙ্গিতে টলটলে ভাবে হাঁটলো দু-এক পা। তারপর দু' দিকে পা ছড়িয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো-এখন সে আবার পাহাড়ের অধিপতি। হাসিমুখে ওদের দিকে তাকিয়ে বললো, আর একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কি! আবার সে আস্তে আস্তে নেমে এলো গর্তের কিনারায়। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললো, দিন, এবার ওঁকে এগিয়ে দিন।

রঞ্জন মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো, সতী, তুমি পারবে?

-পারবো।

-ভয় করছে না তো? তা হলে এখনও ফিরে যেতে পারি।

-না, আর ভয় করছে না।

প্রসেনজিৎ চেঁচিয়ে বললো, চলে আসুন। ফেরার সময় এতটা ভয় নেই।

রঞ্জন ভাস্বতীকে কোমর ধরে উঁচু করে তুলে নিয়ে এলো গর্তের কাছে। ভাস্বতী ফুসগুলো কোঁচড়ে ভরে নিয়েছে, দু' হাত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। তবু তার হাত পৌঁছোচ্ছে না।

-আর একটু, আর একটু -

রঞ্জন পা শক্ত করে শরীরটা ঝুঁকিয়ে দিল সামনের দিকে। একটু এদিক ওদিক হলেই ভাস্বতী নিচে পড়ে যাবে। তাকে ধরে আছে তার স্বামী, অন্য দিকে অপর পুরুষের হাত বাড়ানো। তবু তার শরীর মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে নিচের দিকে নেমে যেতে চায়।

প্রসেনজিৎও অনেকটা শরীর বাকিয়ে খপ করে ধরে ফেললো ভাস্বতীর হাত। তার রোগা চেহারায় অসম্ভব জোর। হাতের ঝটকা টানে সে ভাস্বতীকে নিয়ে এলো এপাশে। ভাস্বতী পায়ে একটা চোট লেগেছে, কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। প্রসেনজিৎ তার হাত ধরে থেকে বললো, নিজে নিজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন?

ভাস্বতীর মুখ রক্তশূন্য। কথা বলতে পারছে না। বুকের মধ্যে টিপ টিপ করছে। গর্তটা পেরুবার সময় নিচের দিকে তাকিয়েই তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল। নিচে অন্ধকার যেন হাঁ করে আছে। ভয়ে সে অবশ হয়ে যায় নি, কিন্তু ভয়ের মধ্যে একটা নেশার মতন ব্যাপার আছে, সেই নেশায় সে আচ্ছন্ন।

প্রসেনজিৎ চেঁচিয়ে রঞ্জনকে বললো, ইনি একলা দাঁড়াতে পারবেন না।

আপনি একটু থাকুন, আমি আগে একে পৌঁছে দিয়ে আসি।

ভাস্বতী প্রায় জড়িয়ে ধরেছে প্রসেনজিতকে। নেশার ঝোঁকে তার পা দুর্বল। প্রসেনজিৎ তার কোমর শক্ত করে ধরে আছে। অদূরে রঞ্জন দাঁড়িয়ে, কিন্তু এতে বিসদৃশ কিছু নেই।

প্রসেনজিৎ পায়ে পায়ে চলে এলো খাড়া পাথরের দিকে। সেখানকার গাছ ও লতাপাতা ধরে ফেলে সামলে নিল অনেকটা। ভাস্বতীকে বললো, এবার আস্তে আস্তে চলুন। এক পা শক্ত করে চেপে তারপর আর এক পা ফেলবেন।

ভাস্বতী তাকিয়ে আছে মন্দিরটার দিকে। এরকমভাবে কোনো মন্দিরে সে কখনো যায় নি। এখন যেন মন্দিরটা তাকে চুম্বকের মতন টানছে।

ওখানে পৌঁছেই অভাবিত কিছু দেখতে পাবে।

হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে প্রসেনজিৎ চেঁচিয়ে উঠলো, ওরে সর্বানাশ!

ভাস্বতী শরীর দুলে উঠলো। প্রসেনজিৎ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গাছপালার মধ্যে গুহার মতন জায়গাটার দিকে। ফিসফিস করে বললো, সেই পাইথনটা।

ভাস্বতী দেখলো মোটা গাছের গুড়ির মতন কি একটা পড়ে আছে নিথরভাবে।

রঞ্জন দেখতে পাচ্ছে না। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করলো, কি? কি হয়েছে?

প্রসেনজিৎ লাল হয়ে যাওয়া মুখখানা ফিরিয়ে বললো, সাপ। পাইথন। তারপরই সে লোহার মতন আঙুলে ভাস্বতীকে আঁকড়ে ওপরের দিকে ছুটলো। মন্দিরের বেদীর কাছে সমতল জায়গায় এনে ভাস্বতীকে দাঁড় করিয়ে আবার নীচে নেমে গেল। গুহা থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বললো, ব্যাটা এইখানে এসে বসে আছে। কি প্রকাণ্ড মুখখানা, এটা যে এত বড় জানতাম না- জেগে আছে, এদিকেই তাকিয়ে আছে, আসবার সময়ই যে আমাদের ধরে নি-

রঞ্জন বললো, এখন কি করবেন? আপনারা চলে আসুন!

-এখান দিয়ে যাওয়া এখন রিস্কি। অসম্ভব। ও যদি একবার মুখটা বাড়িয়ে দেয়--

--আমি আসছি।

রঞ্জন লাফাবার জন্য উদ্যোগ করছে, প্রসেনজিৎ হাত তুলে বললো, দাঁড়ান, দাঁড়ান! আপনার এদিকে এসে কোনো লাভ নেই। খালি হাতে পাইথনের সঙ্গে কিছু করা যাবে না।

নিজের মাথার চুল মুঠো করে চেপে ধরে প্রসেনজিৎ বললো, বোকার মতন কাজ করেছি। চিমটেটা, চিমটেটা যদি থাকতো--

ভাস্বতী দূরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষ দু'জনের চোখ বিস্ফারিত। মাঝখানে গভীর খাদ।

রঞ্জন যে কিছুই করতে পারছে না--এইজন্যই সে অত্যন্ত অসহায় বোধ করছে। এরকম সাপের পরিস্থিতিতে কি করতে হয়, সে জানে না।

সাপেরা কানে শুনতে পায় না বলেই হয়তো প্রসেনজিৎ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে। সে বললো, এটা যে পাহাড়ের এত ওপরে উঠে বসে থাকবে কল্পনাই করি নি!

তর তর করে আবার সে উঠে গেল ওপরে ঢুকে গেল মন্দিরের মধ্যে।

ভাস্বতী ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রঞ্জনের দিকে চেয়ে। রঞ্জনও তাকে দেখছে এক দৃষ্টে। যেন অনেকদিন তারা পরস্পরকে দেখে নি। গাছপালার মধ্যে কি যেন একটা নড়ে উঠলো, মনে হলো, দু'জনেরই দৃষ্টি চলে গেল সেদিকে।

প্রসেনজিৎ মন্দির থেকে কি একটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো--মনে হয় পাথরের কোনো দেবতার মূর্তি। সেটা অস্ত্রের মতন হাতে ধরে বললো, ভাঙা পাথর-টাথরও নেই। রঞ্জনবাবু, আপনি একটা কাজ করতে পারবেন?

-কি?

-এটাকে গুলি না করে উপায় নেই। এটার সামনে দিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়া যায় না। এটাকে মারতেই হবে--এত দামী জিনিসটা--

প্রাণের আশঙ্কার চেয়েও ব্যবসার ক্ষতি হবার জন্য দুঃখিত মুখে প্রসেনজিৎ তাকিয়ে রইলো গুহাটার দিকে। তারপর বললো, রঞ্জনবাবু, আপনি দৌড়ে গিয়ে রাইফেলটা নিয়ে আসতে পারবেন? আমি ততক্ষণ এখানে দাঁড়াচ্ছি। তাড়া করে আসবে না আমি জানি।

রঞ্জন তিক্ত গলায় বললো, --তখনই বলেছিলাম।

-আমার হাতে চিমটেটা থাকলে আমি ঘাবড়াতাম না। আপনি দৌড়ে চলে যান--যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসবেন।

রঞ্জন বললো, ওটা নিয়ে আসতে তো অনেকক্ষণ সময় লাগবে? এতক্ষণ কি হবে?

-আমি সামলাচ্ছি। ওপরে অনেকটা জায়গা আছে--দরকার হলে আমরা গাছে উঠে পড়বো--

-রাইফেলটা কোথায় রেখেছেন?

-দরজার পাশেই দাঁড় করানো। কেন যে সঙ্গে নিয়ে এলাম না!

-আমি তো বলেইছিলাম।

-আমি কল্পনাও করতে পারি নি। দেরি করবেন না, প্লীজ চলে যান--

রঞ্জন ভাস্বতীর উদ্দেশ্যে হাত তুলে বললো, সতী, নিচে নেমে এসো না। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি।

পেছন ফিরে রঞ্জন দৌড়তে শুরু করলো, প্রসেনজিৎ আর ভাস্বতী তার দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে।

রঞ্জন একটা বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যেতেই প্রসেনজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। পাথরের মূর্তিটা সুফতে সুফতে এগিয়ে এলো ভাস্বতীর দিকে। তার একটা হাত ধরে হালকাভাবে বললো, ভেতরে আসুন।

ভাস্বতী তীক্ষ্ণ গলায় বললো, সাপ কোথায়?

উত্তর না দিয়ে প্রসেনজিৎ ভাস্বতীর চোখে চোখ রেখে ঝকঝকে ভাবে হাসলো।

-সাপটা কোথায়? আমি দেখলাম না তো!

-এখনো দেখতে পাচ্ছেন না?

-না।

-চলুন, ভেতরে চলুন।

-আমার তো মনে হলো একটা শুকনো গাছ। সত্যি সত্যিই গাছ।

-আপনি সাপ দেখতে পান নি? তাহলে সে কথা আপনার স্বামীকে বললেন না কেন? আপনার স্বামীকে চেঁচিয়ে বলে দেওয়া উচিত ছিল, এখানে কোনো সাপ নেই।

-আমি ঠিক বুঝতে পারি নি।

-তা হলে এখন আর সে কথা ভেবে কি হবে? আপনারা এটুকুও জানেন না যে একটা পাইথন সাপ এমন কিছু বিপজ্জনক প্রাণী নয়। অন্তত আমার চেয়ে বেশি বিপজ্জনক নয়।

-এর মানে কি?

-আমি তোমাকে চাই।

ভাস্বতীর ফরসা মুখে রোদ্দুরও উত্তেজনায় লালচে আভা। চোখের পাতা কাঁপছে। চোখের গভীর কালো তারায় বহু শতাব্দীর ইতিহাস। এতকাল পরেও কি সে শুধুই ভোগের সামগ্রী?

ভাস্বতী প্রায় একটি মিনিট তাকিয়ে আছে প্রসেনজিতের দিকে। সে নারী, একজন পুরুষ তাকে বলেছে, আমি তোমাকে চাই। তৃতীয় কোনো প্রাণী এখানে সাক্ষী নেই। তবু এই সমস্ত চাওয়া ও পাওয়ার পশ্নগুলো পৃথিবীতে অত্যন্ত জটিল।

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীর কোমরে হাত দিয়ে বেড়াতে যাবার ভঙ্গিতে বললো, চলো, ভেতরটা দেখবে না?

–এ সবই আপনার আগে থেকে ঠিক করা ছিল?

–আমি কখনো সুন্দর কিছু পাই নি। আমি তোমাকে অর্জন করেছি।

–চিমটেটা তখন ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছিলেন।

–সেটাও তুমি বুঝতে পেরেছিলে? কোনো কথাই তোমার স্বামীকে বলো নি তো!

তারপর হঠাৎ সে রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে বললো, আমি তোমাদের আসতে বলেছি? আমি তোমাদের আজ সকালেই চলে যেতে বলেছি না?

–আমি মন্দিরটা দেখতে চেয়েছিলাম।

–আমি অনেকবার বারণ করেছি।

–সেটা অন্য ব্যাপার।

প্রসেনজিৎ বিরক্তির সঙ্গে হাতের মূর্তিটা পাহাড়ের গায়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো, ধ্যুৎ তেরি! তুমি আমাকে লোভ দেখিয়েছিলে।

–আপনি এদের দেবতাকে ফেলে দিলেন?

–আমি এসব পুতুল –টুতুল দু' চক্ষে দেখতে পারি না।

–আমি এখন কি করবো?

–তোমার কোনো ভয় নেই।

–কাল রাত্রে আপনি কথা দিয়েছিলেন, আর কখনও এসব কিছু করবেন না।

–আমি মোটেই কথা দিই নি। তা ছাড়া, আমার মতন আজেবাজে লোকের কথার কি কোনো দাম আছে?

–আমি তো আপনাকে আজেবাজে লোক হিসেবে একবারও ভাবি নি?

–তাছাড়া কি? হঠাৎ এখানে না এসে পড়লে আমার মতন লোকের সঙ্গে কক্ষনো আপনি কথা বলতেন? আমি তো একটা গরীব, ভ্যাগাবন্ড!

–চলুন, আমরা এখান থেকে যাই।

–মন্দির না দেখেই ? তা ছাড়া, সত্যি কথাটা হচ্ছে এই –এখন থেকে একলা আপনি কিছুতেই নামতে পারবেন না।

ভাস্বতী নত মুখে ঢুকলো মন্দিরে। মন্দিরটা বেশ প্রশস্ত এবং আশ্চর্য রকম পরিষ্কার। জানলা-দরজার কোনো কপাট নেই, সব সময় হাওয়া এসে সব ধুয়ে মুছে দিয়ে যাচ্ছে। ভেতরে নেই বিশেষ কিছু-- একটা বেদীর ওপর বসানো একটা মূর্তি, নিচেও আর কয়েকটা মূর্তি ছড়িয়ে রাখা--সবগুলোই পাথরের। নাকচোখ এতই অস্পষ্ট যে কোন্‌টা কার মূর্তি, তা চেনা যায় না। কিংবা হয়তো ভাস্বতীর চেনা কোনো দেবতারই মূর্তি নয়।

মন্দিরের ছাদ থেকে ঝুলছে মস্ত বড় একটা ঘন্টা।

ভাস্বতী ঘোর-লাগা মানুষের মতন হাঁটছে। আস্তে একবার ঘন্টাটা বাজালো। তারপর পাথরের বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে কৌচড় থেকে ফুলগুলো নিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিতে লাগলো।

পেছন থেকে প্রসেনজিৎ এসে শক্ত করে ধরল তাঁর কাঁধ। বললো, শোনো--

–আমাকে ছেড়ে দিন।

–এদিকে ফেরো। শোনো, আমার কথা।

–ফুলগুলো এনেছি যখন, আগে পুজো দিয়ে নিই।

–পুজো? মানুষের কথা কেউ ভাবে না। এই সব পুতুলগুলো এখনও পুজো পাবে?

ভাস্বতীকে ছেড়ে দিয়ে সে উগ্রমূর্তিতে এগিয়ে গেল বেদীর দিকে।

একটান মেরে মূর্তিটাকে ফেলে দিল নিচে। তাতেও তার রাগ কমলো না।

মূর্তিটা বেশ ভারী, দু' হাত দিয়ে সেটা তুলে ছেড়ে দিল বাইরে-- গড়াতে গড়াতে সেটা কোথায় চলে গেল। অন্য ছোট মূর্তিগুলোকে ছিটকে পাঠাতে লাগলো বাইরের দিকে। দাঁতে দাঁত ঘষে বললো, একটাকেও রাখবো না। এই মন্দিরে আর কোনো দেবতা-ফেবতা নেই। শুধু আমি আছি। বলো, কি চাও আমার কাছে?

ভাস্বতী বিস্ফারিত চোখে দেখছে, এই তরুণ রুদ্র কালাপাহাড়কে। মানুষটা এখন সাঙ্ঘাতিক রকম বদলে গেছে-- এমন কি এ কাল রাত্রের প্রসেনজিৎও নয়।

ভাস্বতী তার সামনে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বললো,আপনি আমাকে দয়া করুন।

প্রসেনজিৎ চোখ জ্বালিয়ে হুংকার দিয়ে বললো, দয়া? আমাকে তো কেউ দয়া করে না। তুমি আমাকে একটু দয়া করতে পারো না? আমি কি চেয়েছি তোমার কাছে, দয়া ছাড়া?

ভাস্বতী আস্তে আস্তে বললো, তার আগে আমি মরে যাবো।

-মরা বুঝি এতই সহজ?

-আমি কখনো মরতে চাই নি। কিন্তু আপনি আমার ওপর জোর করতে এলে আমি নিশ্চয়ই মরবো।

প্রসেনজিৎ বুক খালি করে হাসলো। তারপর ফস্ করে একটা সিগারেট জ্বেলে বললো, এসো, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।

ভাস্বতীর হাত ধরে তুলে নিয়ে এলো মন্দিরের বাইরে। পাহাড়ের অন্য দিকে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে বললো, ঐ দ্যাখো এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে নদীটা , সরু সুতোর মতন। ঐ যে দেখা যাচ্ছে পাকা রাস্তা- ওখান থেকে বাসে চেপে সভ্য সমাজে পৌঁছোনো যায়। এই দিকে একটা গ্রাম -ওখানে জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলছে। জঙ্গলে ফুটেছে কত ফুল। এর নাম পৃথিবী, এখানে কত আনন্দ। এ সব ছেড়ে কেউ মরতে চায়? এই সবই আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারি, যদি তুমি আমার কথা শোনো।

ভাস্বতী চুপ করে রইলো।

-ঐ যে ফাঁকা মতন জায়গাটা দেখা যাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছো? ওর খুব কাছেই আমার ঘর। তোমার স্বামী এখন ঐ দিকে ছুটে যাচ্ছে, রাইফেল এনে তোমাকে বাঁচাবে। কিন্তু আমি ইচ্ছে না করলে সে তোমাকে কিছুতেই বাঁচাতে পারবে না। পৃথিবীর কেউ বাঁচাতে পারবে না, আমি তোমার স্বামীর কাছে তোমাকে ফিরিয়ে দেবো-- কোথাও কিছু বদলাবে না.....শুধু আমি একটু শান্তি পাবো। -এসব কি বলছেন?

-বুঝতে পারা যাচ্ছে না? ইচ্ছে করে না বুঝলে, তা আলাদা কথা। তোমার স্বামী আসার পর বলে দিলেই হবে যে পাইথনটা ইতিমধ্যে পালিয়ে গেছে।

-আমি কেন রঞ্জনকে ঠকাবো?

-আমার কথা না শুনলে কি হবে, তাও বলে দিচ্ছি। তোমার হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রাখবো এই মন্দিরের মধ্যে। তোমার স্বামী এলে আমি তাকে বললো, রাইফেলটা দূর থেকে ছুঁড়ে দিতে আমার কাছে। তারপর আমি সাপটাকে গুলি করার ভান করে সোজা তোমার স্বামীকে গুলি করে মেরে ফেলবো। এই পাহাড়ের খাদে একটা ডেড বডি কেউ খুঁজে পাবে না।

-কেন এরকম করবেন?

-তোমাকে পাবার জন্য।

-আপনি তো এরকম নিষ্ঠুর মানুষ নন।

–তোমাকে না পেলে আমি আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠবো।

–আমার কি আছে? আমি তো একটা সামান্য মেয়ে।

–তোমার রূপ আছে। আমি অভাগা, পাহাড় জঙ্গলে পড়ে আছি–

আমাকে একটু রূপের স্পর্শ দেবে না? এতে কি হয়? ভালো লাগলে ফুল ছিঁড়ি, আর একজন নারীকে ভালো লাগলে তাকে ছোঁয়া যাবে না?

এখানে এ-সব নিয়ম চলে না।

–আমি একজন বিবাহিতা নারী।

–তাতে কি হয়েছে? বিয়ে তো একটা বস্তাপচা সামাজিক জগাখিচুড়ি। এখানে কোনো সমাজ নেই–এখানে ওসব মনে রাখার কোনো মানে হয় না। কোনো সভ্য সমাজের মেয়ে আমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে না। তা বলে কি আমি কিছুই পাবো না।

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীর কোমর জড়িয়ে ধরে আছে। ভাস্বতী নিজেকে ছাড়িয়ে নিতেও সাহস পাচ্ছে না। মনের মধ্যে তার তোলপাড় চলছে। সে ভাবছে, আমি জানি না, আমি কি করবো!

প্রসেনজিৎ অভিমানী গলায় বললো আমার বৌদি আমার ভাতের থালায় একদিন ছাই দিয়েছিল। বলেছিল, নিজে রোজগার করতে না পারলে ভাতের বদলে ছাই দেবো! আমার কোনো থাকার জায়গা ছিল না বলে আমি কোনো কলেজে পড়তে পারি নি। কলকাতায় দিনের পর দিন কলের জল খেয়ে কাটিয়েছি। চাকরির জন্য ঘুরেছি হন্যে হয়ে।

এখন যদি কোনো চাকরি.....

–চুপ!

–আমাকে ক্ষমা করুন।

–আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি?

–রঞ্জনকে ক্ষমা করুন–

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীকে ছেড়ে দিয়ে হেসে উঠে বললো, এখন সকলকে দয়া করার কিংবা ক্ষমা করার অধিকার এসে গেছে আমার হাতে, তাই না? একবার কিছুদিনের জন্য একটা মোটামুটি চাকরি পেয়েছিলাম। হঠাৎ যখন চাকরি টা গেল, তখন বড় সাহেবের কাছে কাকুতি- মিনতি করে বলেছিলাম, স্যার হঠাৎ এ ভাবে চাকরি গেল। আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে। তিনি আমাকে শুকনো ভাবে বলেছিলেন, কি করবো ভাই, ইচ্ছে করলেই তো আর আমি সকলকে দয়া করতে পারি না!

ভাস্বতী বললো, আপনি একজনের অপরাধে আরেক জনকে শাস্তি দিচ্ছেন কেন?

–একজন-টেকজন কিছু না। মানুষের মধ্যে দুটো জাত। তোমার স্বামী আর সেই বড় সাহেব এক জাতের। আমি অন্য জাতের।

–আর আমি?

–তুমি আর এই পৃথিবী এক।

প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য ভাস্বতী ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বাইরের দিকে তাকিয়ে বললো,রঞ্জনের ফিরতে কতক্ষন লাগেব?

–দেরি আছে।

–আপনি এই মন্দিরের দেবতাগুলো কেন ফেলে দিলেন? কত মানুষ এদের ভক্তি করে!

–আমি এই মন্দিরে আগে যতবার এসেছি–এখান থেকে নিচের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, আমি বড় অসহায়। আমি জীবনে কিছুই পাই নি।

–আমি আপনাকে কি দিতে পারি?

প্রসেনজিৎ ভাস্বতীর গলায় হাত রেখে বললো, তুমি বড় সুন্দর। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে তোমার চেয়ে সুন্দর আর কিছু নেই।

ভাস্বতী কাঁপা –কাঁপা গলায় বললে, প্রত্যেকের মনের মধ্যেই একটা পশু আছে। আমি সেই পশুটাকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করছিলাম। মানুষের তাই তো উচিত –কিন্তু আমার বুকটাকে সে ছিঁড়ে–খুঁড়ে ফেলেছে।

–পশু নয়, পশু নয়। সেটাই বেঁচে থাকার আনন্দ।

ভাস্বতীর হাত ধরে প্রসেনজিৎ হড়োহড়ি করে আবার চলে এলো। ভেতরে ভাস্বতীকে জড়িয়ে ধরে বললো, আমি তোমাকে চাই। এক্ষুনি।

ভাস্বতী কোনোরকম বাধা দেবার আগেই প্রসেনজিৎ তার শাড়ীর আঁচল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। দ্রৌপদীর মতন এক পাক ঘুরে গেল ভাস্বতী, তারপর শক্ত করে শাড়ী চেপে ধরলো

প্রসেনজিৎ বললো, আমি সব কিছু ছিঁড়ে –খুঁড়ে লন্ডভন্ড করে দিতে পারি–কিন্তু আমি জোর করতে চাই না।

–আমাকে ছেড়ে দাও।

–এখানে কেউ নেই, এমন কি মন্দিরের ঠাকুর ও নেই।

–আমার বিবেক আছে।

–বিবেকটাকেও পোশাকের মতন খুলে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে রেখে দাও।

–আমি তা পারি না।

–আমাকে বাধা দিও না। তুমি কি চাও? তোমার স্বামীর মৃত্যু, না তোমার ঐ ঠুনকো সতীত্ব? তোমাকে না পেলে তোমার স্বামীকে আমি খুন করবোই।

ভাস্বতী আর বাধা দিল না। প্রসেনজিৎ তার শাড়ীটা খুলে ছুঁড়ে রাখালো এক পাশে। তারপর অন্ধ যেমন হাতড়ে হাতড়ে জিনিস খোঁজে, সেই রকম ভাবে সে তার ঠোঁট ছুঁইয়ে ভাস্বতীর গলা,. ঘাড় এবং বুকে কি যেন খুঁজতে লাগলো।

ভাস্বতী মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে।

প্রসেনজিৎ হাত দিয়ে তার ব্লাউজের বোতামে। ব্লাউজ ও ব্রা ঝরে পড়লো মাটিতে। সেই সঙ্গে ভাস্বতীর চোখ থেকে দু ফোঁটা জল।

তার ফরসা চেহারাটা কেমন যেন হঠাৎ অলৌকিক মনে হয়।

প্রসেনজিতের চোখে কয়েক জন্মের বিস্ময়। শিশু যেন দেখছে প্রথম আগুন। কিংবা জহুরী যেমন ভাবে হীরে পরীক্ষা করে, সেইভাবে সে হাত বুলোতে লাগলো ভাস্বতীর শরীরে।

ভাস্বতী তার বুকের কাছে দুটো হাত তুলে রাখলো, যেন সে তার অজাত সন্তানকে আদর করছে।

প্রসেনজিৎ হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলো মাটিতে, ভাস্বতীর কোমর জড়িয়ে ভাস্বতীর একখানা হাতে ঠোঁট ছুঁইয়ে বললো, তুমি সুন্দর! তুমি সুন্দর।

ভাস্বতীর রূপের মধ্যে সচরাচর একটা অহংকার মিশে থাকে। কিন্তু এখন তার শরীর যেন নম্র, বিনীত।

তার চোখের দৃষ্টি নত হয়ে আছে। নগ্ন স্তন দুটি আড়াল করে রেখেছে দু' হাতে। তার সরু কোমরের কাছে কালো শায়ার দড়িতে প্রসেনজিতের হাত।

ভাস্বতী একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, এর নাম কি পাপ নয়?

প্রসেনজিৎ সদর্পে বললো, পাপ-পুণ্য কে সৃষ্টি করেছে? আমার কাছে এই মুহূর্তটাই সত্য। এই মুহূর্তটি যদি আমার জীবনে অমর হয়ে থাকে, তার কোনো মূল্য নেই?

-তুমি কি শুধু তোমার কথাই ভাবছো?

এতক্ষণ বাদে প্রসেনজিতের মুখে একটা দুঃখের রেখা ফুটলো। ভাস্বতীর হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, তুমি কি এখনো চলে যেতে চাও? আমাকে একটুও দয়া করবে না?

-আমি বড় দুর্বল।

-আমার সারা শরীরটা কাঁপছে, তুমি দেখতে পাচ্ছো না?

-আমি নিজেকেও ঠিক বুঝতে পারি না।

-কে পারে? তুমি এখনো যেতে চাও? আমি হঠাৎ উদার হয়েও উঠতে পারি।

ভাস্বতী প্রসেনজিতের চুলে হাত রাখলো। দীর্ঘশ্বাস ফেললো একটা। একটু ঝুকে বললো, কি নির্জন! মনে হয়, পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

প্রসেনজিৎ আবার ধরলো ভাস্বতীর হাত। সুগন্ধ পাবার মতন সে নাক ভরে গন্ধ নিচ্ছে। উত্তেজনা ও কাতরতা মাখানো তার মুখ, অস্ফুট ভাবে বললো, তুমি চলে যাবে? আমি তোমাকে চাই।

ভাস্বতী আবার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তীব্র গলায় বললো, না! না! আমাকে ছেড়ে দাও!

-কেন? তুমি সন্তান কামনায় এই মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলে- আমি তোমায় সন্তান দেবো। আমিই এখানকার দেবতা। তোমার মনে যে দুঃখ আছে-

-আমার কোনো দুঃখ নেই।

-তোমার দুঃখ না থাকতে পারে, আমার দুঃখ আছে। এতকাল আমি যা কিছু পাই নি, সব আজ মিটিয়ে নিতে চাই।

-আমি তোমাকে কতটুকু দিতে পারি?

-তুমিই তো এ পৃথিবীর সব-কিছু!

প্রসেনজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে ভাস্বতীকে প্রচন্ড জোরে জড়িয়ে ধরে। ঠোঁটে চেপে ধরে ঠোঁট! ব্যস্ত হাতে সে শায়ার দড়ির গিট খুলতে পারছে না।

ভাস্বতীর মুখখানা অরুণবর্ণ। দেহের উত্তাপ বেড়ে গেছে অনেকখানি।

তবু সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে। বুভুক্ষুর মতন প্রসেনজিৎ তার বুকে মুখ ঘষছে। ঠিক তখনই নিচে অনেকগুলো মানুষের আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল।

ভাস্বতী মরীয়া হয়ে বললো, ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও!!

-না।

-এক্ষুনি লোকেরা এসে পড়বে। অনেক লোক।

প্রসেনজিৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে খুব সাবধানে উঁকি মেরে দেখলো বাইরে।

নিচে গর্তটার ওপাশে দশ বারো জন নানান রঙের পোশাকপরা নারী পুরুষ। তাদের হাতে ফুল, চাল-কলা, খুচরো পয়সা। সেইগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে ওপরের দিকে -সঙ্গে সব বলছে দুর্বোধ্য ভাষায়।

প্রসেনজিৎ নিঃশব্দ হাসিতে ফেটে পড়লো। মাথা বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে সে হাসছে। খুশির চোটে

সে যেন উন্মাদ হয়ে যাবে।

ভাস্বতী দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। প্রসেনজিৎ তার হাত ধরে বললো, ওরা পুজো দিচ্ছে। একদল লোক পুজো দিতে এসেছে। নাচতে ইচ্ছে করছে আমার। ওরা জানে না, ওখানে ঠাকুর – ফাকুর, দেবতা –টেবতা কিচ্ছু নেই। শুধু আমরা আছি।

–রঞ্জন আসে নি?

–না, এখনো আসে নি। ওরা আমাদের পুজো দিচ্ছে! এসো, তুমি এখানে বসবে এসো!

ভাস্বতীকে টেনে এনে সে বসিয়ে দিল একটা বেদীর ওপর। মুগ্ধভাবে তাকিয়ে বললো, তুমিই এখন দেবী।

একটু পিছিয়ে এসে সে আবার বললো, মানুষকে দেবতার আসনে বসাতে পারলে তার চেয়ে বড় আনন্দের আর কিছু নেই। লাফিয়ে উঠে সে ঘন্টাটা ধরে বাজাতে লাগলো পাগলের মতন, প্রচন্ড জোরে।

সেই পাহাড়, অরণ্য ও সমূহ প্রকৃতি জুড়ে শোনা যেতে লাগলো মন্দিরের ঘন্টার শব্দ।

প্রসেনজিৎ আবার ছুটে এসে চুম্বনে আচ্ছন্ন করে দিল ভাস্বতীকে।

তারপর তাকে টেনে মাটিতে শুইয়ে দিতে চাইলো।

ভাস্বতী প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বললো, আমি তা হলে আত্মহত্যা করবো!

প্রসেনজিৎ কড়া গলায় বললো, কেন?

দ্রুত ব্লাউজটা তুলে নিয়ে পরতে পরতে বললো, তুমি কি পাগল! নিচে অতগুলো লোক পুজো দিচ্ছে–

–আমিও তোমার শরীরটা পুজো করবো।

ভাস্বতী শাড়ীটা তুলে নিতেই প্রসেনজিৎ সেটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে বললো, না! আমি তোমাকে–

সত্যিই সে পাগলের মতন ভাস্বতীর উরুর কাছটা প্রায় কামড়ে ধরলো। মাটির দিকে দু' হাতে জোর করে টানছে।

ভাস্বতী শান্তভাবে বললো, প্রসেনজিৎ, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, কিন্তু তুমি আমাকে পাবে না।

এই প্রথম ভাস্বতী তুমি বলে সম্বোধন করে কথা বললো প্রসেনজিতের সঙ্গে। এখন তার কণ্ঠস্বরে জড়তা আর নেই। এখন সে আবার যেন এক অহংকারী নারী!

ভাস্বতীর ব্যবহারের এই পরিবর্তনে একটু হকচকিয়ে গেল প্রসেনজিৎ।

আহত ভাবে বললো, কেন, তোমাকে আমি পেতে পারি না কেন? কি আমার দোষ?

–আমি যে –কোনো মিথ্যেকেই ঘৃণা করি। তুমি মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে আমাকে এখানে এনেছো।

কিন্তু আমি যে তোমাকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসি, তাতে কোনো মিথ্যে নেই।

–এর নাম ভালোবাসা নয়।

–তা হলে কি?

–অন্য কিছু। তুমি যদি আমাকে ভালোবাসতে, তা হলে রঞ্জনকে এত ঘৃণা করতে না। সে তো কোনো দোষ করে নি। গোপনতা এক জিনিস, মিথ্যে অন্য জিনিস।

পিছলে সরে গিয়ে ভাস্বতী দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে, মন্দিরের পেছন দিকটায়। নিচের মানুষরা এদিকটা দেখতে পায় না। প্রসেনজিৎ তাকে ধরতে আসতেই সে ছুটলো কিনারার দিকে।

নির্মল ব্রোধে উজ্জ্বল এই পৃথিবী, আকাশ তকতকে নীল, কত রকম সুগন্ধের ঝাপটা আসছে- এরই মধ্যে পাহাড় চূড়ায়, একজন কেড়ে নিতে এবং একজন পালাতে চাইছে।

দৌড়োদৌড়ি করে ভাস্বতী আর কতক্ষণ আত্মরক্ষা করবে। সে এসে দাঁড়ালো একেবারে কিনারায়। ভাস্বতী জীবনকে বড় ভালোবাসে, তবু বুঝি সে একবার আত্মহত্যার কথা ভেবেছিলো। সে বললো, আমাকে ধরতে এলে আমি ঠিক লাফিয়ে পড়বো এখান থেকে।

প্রসেনজিৎ এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে আসতে বললো, নিজেকে নষ্ট করে ফেলবে, তবু আমাকে ভোগ করতে দেবে না – এতই মূল্য এই শরীরের?

-- আমাকে ধরার চেষ্টা করো না। আমি তা হলে ঠিক মরবো।

-- এসো, দু'জনে এক সঙ্গে মরি!

– না

-- তা হলে তোমাকেও আমি মরতে দেবো না। আমি তোমার শরীর ভোগ করবো, দু'জনকেই বাঁচাবো।

ভাস্বতী বললো, প্রসেনজিৎ, তোমাকে আমার ভালো লাগে। কিন্তু তুমি আমার কাছে এসো না।

তাও প্রসেনজিৎ লাফিয়ে এসে ভাস্বতীকে ধরতে গেল। ভাস্বতী তাকে একটা ধাক্কা দিতেই সে পিছনে পড়ে গেল গড়িয়ে। পাহাড় থেকে একেবারে নিচে।

প্রসেনজিৎ এক পলকের জন্যও ভাবে নি যে তার নিজেরও পড়ে যাবার সম্ভবনা আছে। ভাস্বতী ভেবেছিলো, তাকে মরতেই হবে। তবু সে আত্মরক্ষার জন্য বাড়িয়ে দিয়েছিল হাত। প্রসেনজিৎ তাল সামলাতে পারলো না, গড়িয়ে পড়ে গেল। অনেক নিচে।

ভাস্বতী 'আঃ' করে একটা শব্দ করলো। প্রথমে সে বিশ্বাসই করতেই পারলো না যে কি হয়ে গেল! সত্যি কি প্রসেনজিৎ আর নেই? অথচ, তারই চোখের সামনে সে প্রথমে দেখালো প্রসেনজিৎকে তার ধাক্কা খেয়ে পিছনে পড়ে যেতে তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে, গাছের ডালপালা ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করে – নিচে নামতে লাগলো, কি যেন চিৎকার করে বলছিল, একটা পাথরে লেগে মাথাটা --। ভাস্বতী চোখ বুজলো।

আবার চোখ খুলে নিচে তাকালো। প্রসেনজিৎকে আর দেখা যাচ্ছে না। অথচ এখনও যেন ভাস্বতীর মনে হচ্ছে, তার শরীরটা কেউ ছুঁতে আসছে। প্রসেনজিতের হাতের উত্তাপ এখনো লেগে আছে তার গায়ে।

ভাস্বতীর সমস্ত শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখখানা লালচে। এই মুহূর্তে তার শরীরের একটা প্রচন্ড অতৃপ্তি। শোক কিংবা ভয়ের চেয়েও বড় এই অতৃপ্ত বাসনা। প্রসেনজিতের জন্য তার বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসতে চাইলো। নিতান্ত জেদের বশেই কি সে প্রসেনজিৎকে ফিরিয়ে দিতে চায় নি?

নিচের দিকে উকি মেরেই ভাস্বতী বুঝতে পারলো, প্রসেনজিতের দেহটা খুঁজতে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। রঞ্জনের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে তাকে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো ভাস্বতী। একটু বাদেই কান্না মুছে ভাবলো, রঞ্জনকে সে কি বলবে? আমিই ছেলেটিকে মেরে ফেলেছি? যদি না মারতাম, তা হলে, ও আমাকে – ।

নিজেকে সামলে নিয়ে ভাস্বতী ধীর পায়ে ফিরে এলো মন্দিরের মধ্যে। শাড়ীটা পরে নিল। মন্দির এখন শুণ্য। নিচের লোকেরা এখনো পুজো দিয়ে চলেছে।

অন্যমনস্কভাবে ভাস্বতী দড়ি ধরে ঘন্টাটা বাজাতে লাগলো। ক্রমশ জোরে, আরও জোরে, অনেক অনেক জোরে। এইবার, এতক্ষণ বাদে সে প্রসেনজিতের জন্য সত্যিকারের শোক করছে।

সেই ঘন্টার শব্দ শুনে গর্তের ওপাশের বিহবল মানুষেরা ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলো।

অনেক দূরে রঞ্জন রাইফেল হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছিল। ঘন্টার শব্দ শুনে সে থেমে গেল। রাইফেলটা লাঠির মতন ব্যবহার করে মাটিতে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো তারপর। তার প্রশান্ত মুখে এখন শ্রমের ক্লান্তি। চোখের পলক পড়ছে না, তীব্র দৃষ্টিতে একবার তাকালো নিজের শরীরের দিকে। সে বুঝতে পেরেছে, আর সাপের ভয় পাবার দরকার নেই। এখনো তাকে অনেকটা উঁচুতে উঠতে হবে।

খিদে পেয়েছিল বলে একটা গাছ থেকে কি একটা অচেনা ফল দেখেও সে পেড়ে নিয়ে খেতে লাগলো কামড়ে কামড়ে। টক টক স্বাদ, মন্দ না।

রঞ্জন মুখ তুলে তাকালো আকাশের দিকে। কি বিরাট বিশাল এই নীলাকাশ। মনে হয় যেন এক রহস্যের যবনিকা। কত কিছু কল্পনা করতে সাধ হয়। ঐ আকাশে কখনো পৃথিবীর ছায়া পড়ে না।

For More Books
Visit
www.BDeBooks.Com